শামসুর রাহমানের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

শামসুর রাহমানের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY, AGARTALA, TRIPURA
81584
31.7.86

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

জীবনানন্দ দাশ

ও

বুদ্ধদেব বসুর

স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

শুধু দরবেশরাই পারেন পুরোপুরি নির্মোহ হ'তে। তাই নিজের কবিতা বাছাইয়ের কাজ এত কঠিন। একটা সীমিত জায়গায় কাদের ঠাঁই দেবো আর কাদেরই বা খারিজ করবো, এই দ্বিধা সারাক্ষণ নির্বাচককে দখল ক'রে রাখে। ভালো-মন্দের বিচার করতে গিয়ে বিড়ম্বিত হ'তে হয় বারংবার। দুর্বলতার ফাঁক ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ে কিছু নিকৃষ্ট রচনা আর কোনো কোনো উৎকৃষ্ট লেখা বাদ পড়ে যায়। এ কারণেই এই বইয়ের কবিতা নির্বাচনে নিজের মতামতকে সম্পূর্ণ আমল না দিয়ে কোনো কোনো বিদগ্ধ কাব্যরসিকের পরামর্শ নিতে প্রলুব্ধ হয়েছি। আমার বন্ধু এবং নন্দিত কথাশিল্পী রশীদ করীম, যিনি সহযোগিতার ক্ষেত্রে বরাবরই উদার, কবিতা বাছাই করতে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

আমার কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা একটু বেশি। এর ফলে যথাসম্ভব নির্দয়তা করার পরও পাণ্ডুলিপি স্থূলকায় হয়ে ওঠে। বরাদ্দ পৃষ্ঠাসংখ্যার দিকে নজর রেখে পাণ্ডু-লিপির কার্শ্যতার প্রতি মনোযোগী হতে হয়েছে। এই মুশকিল আসান করবার উদ্দেশ্যে আমার প্রিয় অগ্রজ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শরণাপন্ন হই। কবিতা-বলীর চূড়ান্ত বাছাইয়ের কাজ তাঁর হাতে সম্পাদিত হয়েছে ব'লে ব্যাপারটি আমার পক্ষে খুবই তৃপ্তিকর। বলা দরকার, জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শংকর ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ না নিলে এই বই হয়তো কলকাতা থেকে এত তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হতো না। বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি ও প্রুফ সংশোধনের কাজ করেছেন তরুণ কবি ও গবেষক মাসুদুজ্জামান। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আরেকটি কথা। এই সংকলন গ্রন্থটিকে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র তিলক পরাতে আমার রুচিতে বাধে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সিরিজের মর্যাদার খাতিরে শেষ পর্যন্ত তরুণ প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর দে'র সিদ্ধান্তকেই মেনে নিয়েছি।

শামসুর রাহমান

সূচীপত্র

ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা

আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি

এক ধরনের অহংকার

আমি অনাহারী

শূন্যতায় তুমি শোকসভা

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে

শামসুর রাহমানের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে

রুপালি স্নান

শুধু দু'টুকরো শুকনো রুটির নিরিবিলি ভোজ
অথবা প্রখর ধূ ধূ পিপাসার আঁজলা ভরানো পানীয়ের খোঁজ
শান্ত সোনালি আল্পনাময় অপরাহ্ণের কাছে এসে রোজ
চাইনি তো আমি। দৈনন্দিন পৃথিবীর পথে চাইনি শুধুই
শুকনো রুটির টক স্বাদ আর তৃষ্ণার জল। এখনো যে শুই
ভীরু-খরগোশ-ব্যবহৃত ঘাসে, বিকেলবেলার কাঠবিড়ালিকে
দেখি ছায়া নিয়ে শরীরে ছড়ায়। — সন্ধ্যা নদীর আঁকাবাঁকা জলে
মেঠো চাঁদ লিখে
রেখে যায় কোনো গভীর পাঁচালি — দেখি চোখ ভ'রে;
ঝিঁঝিঁর কোরাসে স্তব্ধ, বিগত রাত মনে ক'রে
উন্মন-মনে হরিণের মতো দাঁতে ছিঁড়ি ঘাস,
হাজার যুগের তারার উৎস ঐ যে আকাশ
তাকে ডেকে আনি হৃদয়ের কাছে, সোনালি অলস মৌমাছিদের
পাখা-গুঞ্জনে জ্বলে ওঠে মন, হাজার-হাজার বছরের ঢের
পুরোনো প্রেমের কবিতার রোদে পিঠ দিয়ে বসি, প্রগাঢ় মদের
চঞ্চলা সেই রসে-টুপটুপ নর্তকী তার নাচের নূপুর
বাজায় হৃদয়ে মদির শব্দে, ভ'রে ওঠে সুরে শূন্য দুপুর
এখনো যে এই আমার রাজ্যে— এইটুকু ছিল গাঢ় প্রার্থনা—
ঈশ্বর। যদি নেকড়ের পাল দরজার কোণে ভিড় ক'রে আসে,—
এইটুকু ছিল গাঢ় প্রার্থনা— তবুও কখনো ভুলবনা, ভুলবনা।

ভাবিনি শুধুই পৃথিবীর বহু জলে রেখা এঁকে
চোখের অতল হ্রদের আভায় ধূপছায়া মেখে
গোধূলির রঙে একদিন শেষে খুঁজে নিতে হবে ঘাসের শয্যা।
ছন্দে ও মিলে কথা বানানোর আরক্ত কতো তীক্ষ্ণ লজ্জা
দৃষ্টিতে পুষে হাঁটি মানুষের ধূসর মেলায়।
চোখ ঠেরে কেউ চ'লে যায় দূরে, কেউ সুনিপুণ গভীর হেলায়
মোমের মতন চকচকে সুখী মুখ তুলে বলে এঁকে-বেঁকে, 'ইশ,

দিনরাত্তির মধুভুক সেজে পদ্য বানায়, ওহো, কী রাবিশ।'
আকাশের নিচে তুড়ি দিয়ে ওরা মারে কতো রাজা, অলীক উক্তির
হেসে-খেলে রোজ। তবু সান্ত্বনা : আকাশ পাঠায় স্বর্গ-শিশির,
জোনাকি-মেয়েরা বিন্দু-বিন্দু আলোর নূপুরে ভ'রে দেয় মাঠ
গাঢ় রাত্তিরে বিষণ্ণ স্বরে : তোমার রাজ্যে একা-একা হাঁটি,
আমি সম্রাট।

শিশিরের জলে স্নান ক'রে মন তুমি কি জানতে
বিবর্ণ বহু দুপুরের রেখা মুছে ফেলে দিয়ে
চ'লে যাবে এই পৃথিবীর কোনো রুপালি প্রান্তে?
নোনাধরা মৃত ফ্যাকাশে দেয়ালে প্রেতছায়া দেখে, আসন্ন ভোরে
না-পাওয়ার ভয়ে শীতের রাতেও এক-গা ঘুমেই বিবর্ণ হই,
কোনো একদিন গাঢ় উল্লাসে ছিঁড়ে খাবে টুঁটি
হয়তো হিংস্র নেকড়ের পাল, তবু তুলে দিয়ে দরজায় খিল
সত্তাস্বর্গে যেসাসের ক্ষমা মেখে নিয়ে শুধু গড়ি উজ্জ্বল কথার মিছিল।

হয়তো কখনো আমার ঠাণ্ডা মৃতদেহ ফের খুঁজে পাবে কেউ
শহরের কোনো নর্দমাতেই ;—সেখানে নোংরা পিছল জলের
অগুনতি ঢেউ
খাবো কিছুকাল। যদিও আমার দরজার কোণে অনেক বেনামি
প্রেত ঠোঁট চাটে সন্ধ্যায়, তবু শান্ত রুপালি স্বর্গ-শিশিরে স্নান করি আমি।

আত্মজীবনীর খসড়া

গলায় রক্ত তুলেও তোমার মুক্তি নেই।
হঠাৎ-আলোয় শিরায় যাদের আবির্ভাব,
আসবেই ওরা ঝড়ের পরের পাখির ঢেউ
তাদের সুদূরে ফিরিয়ে দেবার মন্ত্র যদি
জানতে, তবে কি প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থতার

কাদাবালি মেখে সত্তা তারায় আত্মজ্যোতি
কখনো হারায়, লোকনিন্দার তীক্ষ্ণ হুলে
অচিরে বিদ্ধ অকালবৃদ্ধ সহজে ব'নে
কেটে যেত কাল আকাশকুসুম জল্পনায় ?
তারা যাকে বলে সফলতা তার চিহ্ন তুমি
সারা পথ হেঁটে এখনো কিছুই পাওনি খুঁজে :
সহজ তো নয় স্বর্গসিঁড়ির আশায় বাঁচা।

যার দেখা পেয়ে চলতি পথের সূর্যোদয়ে
মুগ্ধ তরুণ অমরত্বের মন্ত্র পেলো,
অচেনা মাঠের বিহ্বল থামে দাঁড়িয়ে একা
পেতে চাও ঐ নদীর নিবিড় শ্রাবণে যাকে,
ইচ্ছে জোয়ারে ভেসে-ভেসে তুমি ট্রেনের পথে
নেমে যাও সুখে হঠাৎ বেঠিক ইস্টিশনে
খেয়ালি আশায় সন্ধানে যার দিনের শেষে
গ্রামান্তে কোনো, তাকেই তো বলো সুন্দর, না ?

গোলকধাঁধায় তাকে খোঁজা ভার সত্য জেনো,
তার জন্যেই জপেছো গানের কত-না কলি,
পথ চেয়ে আছো সকল সময় প্রতীক্ষায়
কে জানে কখন আসবে সে তার শান্ত পায়ে—
আসবে যেদিন কী দিয়ে বরণ করবে তাকে ?

তোমাকে দীর্ণ ক'রে যারা আসে, প্রস্ফুটিত
পদ্মের মতো সৃজনী আভায় কামসুরভি
ছড়ায় হৃদয়ে, কোটি জ্যোতিকণা বিলায় মনে,
সমস্ত রাত একা-একা ঘরে চার-দেয়ালে
মাথা খুঁড়ে তুমি মরছো যাদের প্রতীক্ষায়,
চিনেছো তাদের বহুবার তবু কেন যে এই
লগ্নে রক্তে কুমারীর ভীরু চঞ্চলতা,

আসবেই ওরা— পারবেনা তুমি ফেরাতে আর।
ভেবেছো কখনো স্বরের সভায় আসন পাওয়া
সম্ভব হবে ? এই যে ছড়ানো কথার কালো
দুরাশায় আজো জোনাকি-জীবন, কখনো তারা
দূরের শরতে স্মৃতিগন্ধার পাবে কি আলো ?
একথা কখনো জানবেনা তবু মৃত্যু হবে।

শহর জেগেছে, দূরে ঘণ্টায় প্রাণের ধ্বনি,
রোগীর শরীরে নামলো নিদ্রা হাসপাতালে,
যারা কোনোদিন ভুলেও পেলোনা আপন জন,
ছেঁড়াছোঁড়া সেই ক'জন রাতের জুয়োশেষের
ক্লান্তিতে ফের ভিড়লো ধোঁয়াটে রেস্তোরাঁয়।
আস্তাবলের সহিস ঘোড়ার পিঠ বুলোয়,
শীতের শুকনো ডালের মতোই ভিস্তি বুড়ো
কেঁপে-কেঁপে তার জল-মসৃণ মশক বয় ;
পথের কুকুর হাই তুলে চায় ধুলোয়, কেউ
জানল না ভোর ফুটলো তরুণ ফুলের মতো,
খণ্ডিতা নারী এখনো আলোর আলিঙ্গনে।
আজো আছে চিরকস্তুরীটুকু লুকোনো মনে :
সেই সৌরভে উন্মন তুমি, তখন জানি
দেয়ালে তোমার কাঠকয়লার আঁচড় পড়ে ॥

নির্জন দুর্গের গাথা

মানিনি জীবন সমুদ্র সন্ধানে
চোরাবালিতেই পরম শরণ নেবে।
আশার পণ্যে পূর্ণ জাহাজ সে-ও
ডোবা পাহাড়ের হঠকারিতায় ঠেকে
হবে অপহৃত— ভাবিনি কখনো আগে।

দিনের সারথি বল্গা গুটিয়ে নিলে,
যখন রাত্রি কৃষ্ণ কবরী নেড়ে
আনে একরাশ তারা-ফুল থরথর,
দু'হাতে সরিয়ে শ্যাওলার গাঢ় জাল
চমকে তাকাই আমিও মজ্জমান।

ভবিষ্যতের ঝাঁপির অন্ধকারে
যা-কিছু রয়েছে আমার জন্যে শেষে
সবি নিতে হবে দৈবের দয়া মেনে ?
ব্যঙ্গ দৃষ্টি আড়ালেই ঝলসায়।

নির্জনতার কারাগারে সঁপে প্রাণ
আত্মদানের মহৎ দুর্গ গড়ি।
যদি সে প্রাকার-বিরোধী অশ্বখুরে
অচিরাৎ তার দৃঢ় নির্ভর ভোলে,
যদি দর্পের দর্পণ হয় গুঁড়ো,
ঝড়ের সামনে ভাগ্যের শাখা মেলে
কাকে পর ভেবে কাকে বা আপন জেনে
সাধের শ্রমেরে দিব যে জলাঞ্জলি।

যদি হতো ঐ তারাদের মতো চোখ
তারার মতন নিবিড় লক্ষ কোটি,
দু'দিনের ঘরে হয়তো পেতাম তবে
বেলা না ফুরোতে তাকে এই চরাচরে
চোখের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেখার সুখ।
অবুঝ আমার আশা উদ্বাহু তবু।

বিরূপ লতার গুচ্ছে জড়িয়ে শিং
কালো রাত্তিরে তৃতীয় [illegible]র একা
কাঁদে প্রত্যহ হরিণ-হৃদয় যার
তাকে নেব চিনে : প্রাণের দোসর সে-যে

সম্মুখে কাঁপে অমোঘ সর্বনাশ।
দিনের ভস্ম পশ্চিমে হয় জড়ো,
অনেক দূরের আকাশের গাঢ় চোখে
রাত্রি পরায় অতল কাজল তার।
এমন নিবিড় স্মৃতি-নির্ভর ক্ষণে
বলি কারো নাম, হৃদয়ের স্বরে বলি।
জ্বলি অনিবার নিজেরই অন্ধকারে।

এতকাল ধ'রে আমার আজ্ঞাবহ
ঘাতক রেখেছে তীক্ষ্ণ কুঠার খাড়া,
সেই যূপকাঠে নিজেই বলির পশু।

উঁচু মিনারের নির্জনতায় ম'জে
ভেবেছি সহজে বিশ্বের মহাগান
আমার প্রভাতে সন্ধ্যায় আর রাতে
ঝর্না-ধারায় আনবেই বরাভয়।
সেই বাসনার প্রভূত জাবর কেটে
শূন্যে ছুঁড়েছি দুরাশার শত ঢিল।

প্রতিপক্ষের কূটচক্রের তান
পশেনি কর্ণে, ওদের বর্ণবোধে,
সাঙ্ক্য ভাষায় করিনিকো দৃক্‌পাত।
কবন্ধ যারা নিত্য জন্মাবধি
অন্ধের মতো তাদের যষ্টি ধ'রে
দ্বন্দ্বের ঘোরে ছুঁইনি গতির বুড়ি।

কোনো পরিচিতাকে

জানতাম একদা তোমার চোখে জারুলের বন
ফেলেছে সম্পন্ন ছায়া, রাত্রির নদীর মতো শাড়ি
শরীরের চরে অন্ধকারে জাগিয়েছে অপরূপ

রৌদ্রের জোয়ার কতো। সবুজ পাতায় মেশা টিয়ে
তোমার ইচ্ছার ফল লাল ঠোঁটে বিঁধে নিয়ে দূরে
চরাচরে আত্মলোপী অলীক নির্দেশে। শাশ্বত সে

বৃক্ষের গৌরবে তুমি দিয়েছো স্বামীকে দীপ্ত কামের মাধবী,
শিশুকে সুপুষ্ট স্তন। দাম্পত্য প্রণয়ে সোহাগিনী
প্রেমিকার মতো হৃদয়ের অন্তহীন জলে, ঢেউয়ে
খর বাসনাকে ধুয়ে দান্ত সাধকের ধ্যানে তবু
গড়েছো সংসার। প্রত্যহের দীপে তুমি তুলে ধরো
আত্মার গহন নিঃসঙ্গতা, নক্সী-কাঁথা-বোনা রাতে
স্বপ্নের প্রভায় জ্বলো। তোমার সত্তায় কী উজ্জ্বল
নিঃশঙ্ক অপ্রতিরোধ্য ফল জ্বলে, স্বর্গের সম্ভার।

এবং এখন জানি করুণ কাঠিন্য ভরা হাতে
আত্মায় নিয়েছো তুলে নগরের ফেনিল মদিরা,
আবর্তে আবর্তে মত্ত কাম, প্রাণে স্থির অন্ধ গলি।
হে বহুবল্লভা তুমি আজ কড়ায় ক্রান্তিতে শুধু
গু'ণে নাও নিষ্কাশিত যৌবনের অকুণ্ঠ মজুরি।
রূপের মলম মেখে সুচতুর মোমের ঊরুর
মদির আগুনে জেলে পুরুষের কবন্ধ বিনোদ
কখনো জানিনি আগে এত ক্লান্ত, এত ক্লান্ত তুমি॥

অপাঙ্‌ক্তেয়

যেহেতু লৌকিকতার দড়িদড়া ছিঁড়ে বেপরোয়া
উঁচিয়ে মাস্তুল সুন্দরের ভাস্বর সে নীলিমায়
ভ্রমণবিলাসী তাই সম্মিলিত মুখর প্রস্তাবে
দিয়েছো উন্মাদ আখ্যা, উপরন্তু চরশক্র ভেবে
আমাকে করেছো বন্দী সন্দেহের অন্ধ ঊর্ণাজালে।

অথচ নারীর গর্ভে তমসায় নক্ষত্র-খচিত
আয়ুর অবোধ স্বপ্নে জন্মেছি আমিও, দন্তহীন
বাসনায় নিয়েছি অধীর মুখে স্তনাগ্র কোমল,
আর জুয়াড়ির মতো আপনাকে করেছি উজাড়
তীব্রতায় ধাতুর উজ্জ্বল মদে, ধুতুরার ঘ্রাণে।

মিথ্যাকে কখনো ভুলে সুন্দর ফুলের রমণীয়
স্তবকের মতো আমি পারিনি সাজাতে বঞ্চনায়,
বরং করিনি দ্বিধা কণ্ঠে তুলে নিতে আজীবন
সত্যের গরল। ফলত সে উন্মিদ তৃতীয় চোখ
অন্ধের বিমূঢ় রাজ্যে বাধ সাধে ব'লে ক্রোধ জ্বলে

বারবার আত্মতৃপ্ত এই অন্ধ কূপের গভীরে।
নেকড়ে মতো সব মানুষের দঙ্গল এড়িয়ে,
মাংসের মূঢ়তা ছেড়ে নৈঃসঙ্গ্যে সম্পন্ন হ'য়ে চলি:
উত্তপ্ত তামার মতো শরীরের পৌত্তলিক যেন
অর্পিত, গ্রথিত প্রাণ ভীষণের আগ্নেয় মালায়।

জীবনকে সহজ নিয়মে নেয়া যেতো প্রথামতো,
কিন্তু তবু জ্যামিতির নেপথ্যে মায়াবী গুঞ্জরণে
মজেছি স্বতই দুঃখে অর্থ থেকে অর্থহীনতায়।
কুৎসার ধারিনি ধার, বরং নিজেরই আচরণে
বিপন্ন হ'য়েও শুধু সারাক্ষণ অস্তিত্বের ধার

রেখেছি প্রখর তীক্ষ্ম আর ব্যালে নর্তকের মতো
চেয়েছি গতির ধ্যানে অনন্তের একটি মাধবী
উন্মোচিত আবর্তিত হৃদয়ের হলুদ আকাশে।
অথচ নিশ্চিত জানি জীবনের একান্ত আপেল
অলক্ষিতে রক্তিম চাঁদের মতো ঝ'রে সুনিপুণ

কীটের সুখাদ্য হবে যথারীতি। মাঝে-মাঝে তবু
নিজের ঘরের ছিদ্রে চোখ রেখে দেখি পৃথিবীকে,
যেমন বিকারী দেখে যুগলের মদির নগ্নতা,
কামকলা, অবসাদ, নিদ্রায় মধুর শিউরনো।
তোমরা সজ্জন সহৃদয়, বলি হৃদয়ের স্বরে :

আমাকে গ্রহণ করো তোমাদের নিকানো উঠোনে
নারী আর শিশুর ছায়ায় আঁকা, রক্তকরবীতে।
আমার জীবনে নেই তৃপ্তির গৌরব, আর আমি
অর্থ খুঁজি চক্রে চক্রে, সমর্পিত মহাশূন্যতায়।

কী অর্থ নিহিত তবে নিপতিত গাছের পাতায় ?

কবর-খোঁড়ার গান

মদের নেশা খাঁটি সারা জাহানে,
বাকি যা থাকে তার বেবাক ঝুট্‌।
বাঘিনী যেন সেই মেয়েমানুষ,
যার আঁধারে কাল কেটেছে রাত।

যার আঁধারে কাল কেটেছে রাত
নেশার মতো তার স্মৃতির জ্বালা।
আলিঙ্গনে তার দুনিয়াদারি
নিমেষে ভুলে যাই অতল মোহে।

নিমেষে ভুলি সাধ অতল মোহে।
মোহিনী ও-মুখের মিথ্যা বুলি
সত্য সার ভাবি, এবং আমি
ধারি না ধার কোনো মহোদয়ের।

ধারি না ধার কোনো মহোদয়ের,
আমরা তিনজন খুঁড়ছি গোর।
নিপুণ বিদ্রূপে অন্তহীন
দূরের আসমানে জ্বলে দিনার।

দূরের আসমানে জ্বলে দিনার।
কোদালে অবহেলে উপড়ে আনি
মাটির ঢেলা আর মড়ার খুলি।
শরিফ কেউকেটা কী ক'রে চিনি?

শরিফ কেউকেটা কী ক'রে চিনি?
মাটির নিচে পচে অন্ধ গোরে
হয়তো সুন্দরী কুরূপা কেউ।
কোরোনা বেয়াদবি বান্দা তুমি।

কোরোনা বেয়াদবি বান্দা তুমি।
বাদশা নেই কেউ, গোলাম সব,
বেগম চায় পেতে বাঁদির সুখ:
আউড়ে গেছে কতো সত্যপীর।

আউড়ে গেছে কতো সত্যপীর:
সমরকন্দ্ আর বোখারা তা'র
রূপসী মাশুকের যোগ্য নয়।
সে-সব ছেঁদো কথা, মস্ত ফাঁকি।

সে-সব ছেঁদো কথা, মস্ত ফাঁকি।
বিবেক বিলকুল লক্ষ্মীছাড়া,
মনের পশুটাও চশমখোর।
আমরা তিনজন খুঁড়ছি গোর।

আমরা তিনজন খুঁড়ছি গোর।
হয়তো রুটি আর গোলাপ-কুঁড়ি
যুগ্মতায় জ্বলে চাওয়া-পাওয়ায়,
নেশার মতো খাঁটি নেই কিছুই।

নেশার মতো খাঁটি নেই কিছুই,
সাচ্চা শুধু এই দেহের দাবি।
মানতে নয় রাজি বেয়াড়া মন
দীন ও দুনিয়ার ধাপ্পাবাজি॥

পিতা

প্রাণে গেঁথে সূর্যমুখী-উন্মুখতা খুঁজি আজো তাঁকে
সর্বত্র অক্লান্ত শ্রমে। স্বপ্নের মৃণালে মুখ তাঁব
জ্যোতির্ময় কল্যাণের মতো ফুটে' অভ্র-শুভ্রতার
অতল সমুদ্রে ডোবে—খুঁজি আজো বিদেহী পিতাকে
অজ্ঞাত, বিরূপ এই রুক্ষ দেশে মৌন বাসনাকে
নক্ষত্রের মতো জ্বেলে চাই তাঁকে দুর্নিবার
আতঙ্কের মুখোমুখি, যেমন সে মৃগতৃষ্ণিকার
নিঃসঙ্গ পথিক চায় পান্থপাদপের মমতাকে।

তিনি নন জন্মদাতা, অথচ তাঁকেই পিতা ব'লে
জেনেছি আজন্ম তাই মুমুক্ষু কালের অনুরাগে
সমর্পিত তাঁরই কাছে। জীবনের সব মধুরিমা
করেছি নিঃশেষ শুধু অশেষ সন্ধানে জ্বলে' জ্বলে।
তিনি নন বিধাতা অথচ ব্যাপ্ত সত্তার পরাগে---
তবে কি উপমা তাঁর চৈতন্যের ভাস্বর নীলিমা?

রৌদ্র করোটিতে

দুঃখ

আমাদের বারান্দার ঘরের চৌকাঠে
কড়িকাঠে চেয়ারে টেবিলে আর খাটে
দুঃখ তার লেখে নাম। ছাদের কার্নিশ, খড়খড়ি
ফ্রেমের বার্নিশ আর মেঝের ধুলোয়
দুঃখ তার আঁকে চকখড়ি
এবং বুলোয়
তুলি বাঁশি-বাজা আমাদের এই নাটে।

আমাদের একরত্তি উঠোনের কোণে
উড়ে-আসা চৈত্রের পাতায়
পাণ্ডুলিপি বই ছেঁড়া মলিন খাতায়
গ্রীষ্মের দুপুরে ঢকঢক্
জল-খাওয়া কুঁজোয় গেলাসে, শীত-ঠকঠক্
রাত্রির নরম লেপে দুঃখ তার বোনে
নাম
অবিরাম।

পিরিচ চামচ আর চায়ের বাটিতে
রোদ্দুরের উল্কি-আঁকা উঠোনের আপন মাটিতে
দুঃখ তার লেখে নাম।

চৌকি, পিঁড়ি শতরঞ্জি চাদর মশারি
পাঞ্জাবি তোয়ালে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি
প্রখর কম্বল আর কাঁথায় বালিশে
ঝাপসা তেলের শিশি টুথব্রাশ বাতের মালিশে
দুঃখ তার লেখে নাম।
খুকির পুতুলরানী এবং খোকার পোষমানা
পাখিটার ডানা

মুখ-বুজে-থাকা
সহধর্মিণীর শাদা শাড়ির আঁচলে দুঃখ তার
ওড়ায় পতাকা।
পায়ে-পায়ে-ঘোরা পুষি বেড়ালের মসৃণ শরীরে
ছাগলের খুঁটি আর স্বপ্নের জোনাকিদের ভিড়ে
বৃষ্টি-ভেজা নিবন্ত উনুনে আর পুরোনো বাড়ির
রাত্রিমাখা গন্ধে আর উপোসী হাঁড়ির
শূন্যতায় দুঃখ তার লেখে নাম।

হৃদয়ে-লতিয়ে-ওঠা একটি নিভৃততম গানে
সুখের নিদ্রায় কিবা জাগরণে, স্বপ্নের বাগানে,
অধরের অধীর চুম্বনে সান্নিধ্যের মধ্যদিনে
আমার নৈঃশব্দ্য আর মুখর আলাপে
স্বাস্থ্যের কৌলীন্যে ক্রুর যন্ত্রণার অসুস্থ প্রলাপে,
বিশ্বস্ত মাধুর্যে আর রুক্ষতার সুতীক্ষ্ণ সঙ্গীনে
দুর্বিনীত ইচ্ছার ডানায়
আসক্তির কানায় কানায়
বৈরাগ্যের গৈরিক কৌপীনে
দুঃখ তার লেখে নাম।

রৌদ্রঝলকিত ভাঙা স্তিমিত আয়নায়
নববর্ষে খুকির বায়নায়
আমার রোদ্দুর আর আমার ছায়ায়
দুঃখ তার লেখে নাম।

অবেলায় পাতে-দেয়া ঠাণ্ডা ভাতে
বাল্যশিক্ষা ব্যাকরণ এবং আদর্শ ধারাপাতে
ফুলদানি, বিক্ষত শ্লেটের শান্ত মেঘলা ললাটে
আর আদিরসাত্মক বইয়ের মলাটে
চুলের বুরুশে চিরুনির নম্র দাঁতে
দুঃখ তার লেখে নাম।

কপালের টিপে,
শয্যার প্রবাল দ্বীপে,
জুতোর গুহায় আর দুধের বাটির সরোবরে
বাসনার মণিকণ্ঠ পাখিডাকা চরে
দুঃখ তার লেখে নাম।

বুকের পাঁজর ফুসফুস আমার পাকস্থলীতে
প্লীহায় যকৃতে আর অন্ত্রের গলিতে
দুঃখ তার লেখে নাম।

আমাব হৃৎপিণ্ডে শুনি দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রাক্ দ্রাক্
দুঃখ শুধু বাজায় নিপুণ তার ঢাক।

ঐ ভীমরতিভরা পিতামহ ঘড়ির কাঁটায়
বার্ধক্য-ঠেকানো ছড়ি, পানের বাটায়
গোটানো আস্তিনে দুমড়ানো পাৎলুনে
কাগজেব নৌকা আর রঙিন বেলুনে
দুঃখ তাব লেখে নাম।

কখনো না-দেখা নীল দূর আকাশের
মিহি বাতাসের
সুন্দর পাখির মতো আমার আশায়
হৃদয়ের নিভৃত ভাষায়
দুঃখ তাব লেখে নাম।

একজন লোক

লোকটার নেই কোনো নাম' 'ক।
তবু তার কথা অষ্টপ্রহর
ভেবে লোকজন অবাক বেবাক।

লোকটার নেই কোনোখানে ঠাঁই।
জীবন লগ্ন পথের ধুলায়,
হাতে ঘোরে তার অলীক লাটাই।

লোকটা কারুর সাতে-পাঁচে নেই।
গাঁয়ের মোড়ল, মিলের মালিক—
তবু ঘুম নেই কারুর চোখেই ;
লোকটার কাঁধে অচিন শালিক।

বলে দশজনে এবং আমিও
রোদ্দুর খায় লোকটা চিবিয়ে,
জ্যোৎস্নাও তার সাধের পানীয়।
হাজার প্রদীপ জ্বালায় আবার
মনের খেয়ালে দেয় তা' নিবিয়ে।

মেঘের কামিজ শরীরে চাপিয়ে
হাঁটে, এসে বসে ভদ্রপাড়ায়।
পাথুরে গুহায় পড়েনা হাঁপিয়ে
সে-ও সাড়া দেয় কড়ার নাড়ায়।

তবু দশজনে জানায় নালিশ :
লোকটা ঘুমায় সারাদিনমান,
কাছে টেনে নিয়ে চাঁদের বালিশ।

আত্মপ্রতিকৃতি

আমি তো বিদেশী নই, নই ছদ্মবেশী বাসভূমে—
তবে কেন [illegible] অন্ধকার ঘরে রাজা কেন
দেশের দশের কাছে সারাটা জীবন ডুগডুগি
বাজিয়ে শোনাবো কথা, নাচাবো বাঁদর ফুটপাতে ?

AGARTALA, TRIPURA
8/5 67
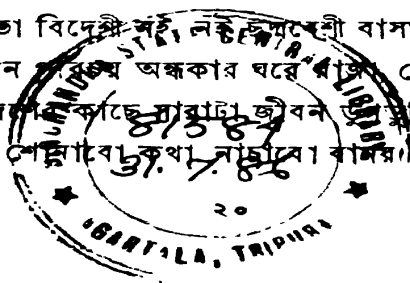
কেন তবে হরবোলা সেজে সারাক্ষণ হাটে মাঠে
বাহবা কুড়াবো কিংবা স্টেজে খালি কালো রুমালের
গেরো খুলে দেখাবো জীবন্ত খরগোশ দর্শকের
সকৌতুক ভিড়ে ? কেন মুখে রঙ মেখে হবো সঙ ?

না, তারা জানেনা কেউ আমার একান্ত পরিচয় :
আমি কে ? কী করি সারাক্ষণ সমাজের চৌহদ্দিতে ?
কেন যাই চিত্রপ্রদর্শনী, বারে, বইয়ের দোকানে,
তর্কের তুফান তুলি বুদ্ধিজীবী বন্ধুর ডেরায় ?
না, তারা জানেনা কেউ।

অথচ নিঃসঙ্গ বারান্দার
সন্ধ্যা, এভেন্যুর মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা, সার্কাসের
আহত ক্লাউন আর প্রাচীরের অতন্দ্র বিড়াল,
কলোনির জীবনমথিত ঐকতান, অপ্সরীর
তারাবেঁধা কাঁচুলি, গলির অন্ধ বেহালাবাদক
র‍্যাকের স্থির মাছ, সেজান আপেল জানে কতো।
সহজে আমাকে, জানে কবরের দুর্বিনীত ফুল।

একটি মৃত্যুবার্ষিকী

হয়নি খুঁজতে বেশি, সেই অতদিনের অভ্যাস,
কী করে সহজে ভুলি ? এখনো গলির মোড়ে একা
গাছ সাক্ষী অনেক দিনের লঘু-গুরু ঘটনার
আর এই কামারশালার আগুনের ফুলকি ওড়ে
রাত্রিদিন হাপরের টানে। কে জানতো স্মৃতি এতো
অন্তরঙ্গ চিরদিন ? জানতাম তুমি নেই তবু

আঠারোর সাতে কড়া নেড়ে দাঁড়ালাম
দরজার পাশে। মনে হলো হয়তো আসবে তুমি,

মৃদু হেসে তাকাবে আমার চোখে, মসৃণ কপালে,
ছোঁয়াবে আলতো হাত, বলবে 'কী ভাগ্যি আরে
আপনি ? আসুন। কী আশ্চর্য। ভেতরে আসুন।' দেখি

অন্ধকারে বন্ধ দারোজায় দু'টি চোখ আজো দেখি
উঠলো জ্ব'লে। কতদিনকার সেই চেনা মৃদু স্বর
আমার সত্তাকে ছুঁয়ে বাতাসে ছড়ালো
স্মৃতির আতর।

শূন্য ঘরে সোফাটার নিষ্প্রাণ হাতল
কী ক'রে জাগলো এইক্ষণে ? একটি হাতের নড়া
দেখলাম যেন, চা খেলাম যথারীতি
পুরানো সোনালি কাপে, ধরালাম সিগারেট, তবু
সবই ঘটলো যেন অলৌকিক
যুক্তি-অনুসারে।

মেঝের কার্পেটে দেখি পশমের চ'টি
চুপচাপ, তোমার পায়ের ছাপ খুঁজি
সবখানে, কৌচে শুনি আলস্যের মধুর রাগিণী
নিঃশব্দ সুরের ধ্যানে শিল্পিত তন্দ্রায়।

জানালায় সিল্ক নড়ে, ভাবি কতো সহজেই তারা
তোমাকে কীটের উপজীব্য করেছিলো,
সারাক্ষণ তোমার সান্নিধ্যে পেতো যারা
অনন্তের স্বাদ।

বারান্দায় এলাম কী ভেবে অন্যমনে, পারবোনা
বলতে আজ। জানতাম তুমি নেই, তবু

আত্মহত্যার আগে

শয্যাত্যাগ, প্রাতরাশ, বাস, ছ'ঘণ্টার কাজ, আড্ডা,
খাদ্য, প্রেম, ঘুম, জাগরণ ; সোমবার এবং মঙ্গলবার
বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি আর রবিবার একই
বৃত্তে আবর্তিত আর আকাশ তো মস্ত একটা গর্ত—
সেখানে ঢুকবো নেংটি ইঁদুরের মতো। থরথর
হৃদয়ে প্রতীক্ষা করি, স্বপ্ন দেখি আগামী কালের
সারাক্ষণ, অনেক আগামীকল্য উজিয়ে দেখেছি
তবু থাকে আরেক আগামী কাল। সহসা আয়নায়
নিজের ছায়াকে দেখি একদিন— উত্তীর্ণ তিরিশ।

পূর্ণিমা চাঁদের দিকে পিঠ দিয়ে, অস্তিত্বকে মুড়ে
খবরের কাগজে ছড়াই দৃষ্টি যত্রতত্র, নড়ি,
মাঝে-মাঝে ন'ড়ে বসি, সত্তার স্থাপত্যে অবিরল
অলক্ষ্যে গড়িয়ে পড়ে মাছের ঝোলের মতো জ্যোৎস্না
আর আমি বিজ্ঞাপন পড়ি, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ি :

এবার কলপ দিন, আপনি তো জানেন অকাল-
পক্ক চুলে কলপ লাগালে অনায়াসে ফিরে আসে
ফেরারী যৌবন···আর এই ফলপ্রদ টনিকটা
খাবেন প্রত্যহ তিনবার ঠিকঠাক দাগ মেপে
অর্থাৎ চায়ের চামচের দু'চামচ এবং খাবার আগে
কিংবা পরে, তাহ'লে বাড়বে ক্ষিদে আর স্নায়ুগুলি
নিশ্চিত সবল হবে, যদি খান সুস্বাদু টনিক।

ধরা যাক যা-কিছু লিখেছি সবি পড়ে লোকে, প'ড়ে
প্রচুর তারিফ করে, ব্যাঙ্কের খাতাও স্ফীতকায় ;
উন্নতির সবগুলি গোল ধাপ পেয়েছে আমার
সুকৃতী পায়ের ছাপ, ইচ্ছাপূরণের যত গান

হৃদয়ের সাতটি মহলে পেলো খুঁজে সফলতা ;
জীবনের প্রতিটি সুন্দর স্বপ্ন পাপড়ি মেলে
চেয়েছে আমার দিকে : পত্নীর গার্হস্থ্য প্রণয়ের
পরিণাম পুত্র-কন্যা সহজে এসেছে যথারীতি
এবং নিজের বাড়ি, সাজানো বাগান, ধরা যাক,
গাজরের ক্ষেত, মুর্গী ইত্যাদির স্বচ্ছন্দ বিন্যাসে
মানবজীবন ধন্য। শৈশবের সাধের কল্পনা
নক্সা অনুসারে, ধরা যাক, একে একে ঘটলো সবি।

অনেক সমুদ্র ঘুরে কতো বন্দরের গন্ধ মেখে
একদিন সার্থবাহ বার্ধক্যের অবসন্ন তটে
ফিরে আসে পণ্যবাহী সার্থক জাহাজ, পালতোলা,
গলাফোলা নাবিকের গানে গুঞ্জরিত। মূর্খ যত
চেঁচিয়ে মরুক তারা, পূর্ণতার স্তবে রাত্রিদিন
জপেছি ভীষণ মন্ত্র ক্ষয়ে ক্ষয়ে···কিন্তু তারপর ?

আড় হ'য়ে বিকেলের রোদ পড়ে চায়ের আসরে ;
কয়েকটি সুবেশ তরুণ-তরুণীর সংগত সংলাপে
গোলাপ বাগান জ্বলে রক্তিম কুঁড়ির জাগরণে
মুহূর্তের অতন্দ্র মালঞ্চে। টেবিলের ফুলদানি
জ্যোৎস্নার বিস্ময়ে ফোটে মহিলার অন্ধকার ঘরে।
নিয়ন আলোর মতো কারুর হাসির শত কণা।
জাগায় স্মৃতির শব, হাড়হিম দেহে লাগে তাপ।
আমি নই ইডিপাস, তাহ'লে কী ক'রে উচ্চরোলে
সভাসদ মাঝে করি উচ্চারণ : 'অবশেষে বলি
ভালো সবকিছু ভালো ?'

অসংগতি, না আমার মধ্যে নেই, রয়েছে সেখানে
রেস্তোরাঁয়, অন্ধকার দেয়ালে, আমার চতুর্দিকে,
বলতে পারো বরং নিজেই আমি নিমজ্জিত, ওহে,
এ-অসংগতির মধ্যে। লিপস্টিক ঘ'ষে-মুছে-ফেলা

ঠোঁটের মতন আত্মা নিয়ে কী আশ্বাসে বাঁচা যায়
যন্ত্রণায় অগ্নিকুণ্ডে, বিরক্তির মাছির জ্বালায় ?

যেহেতু উপায় নেই ফেরবার, আমার সম্মুখে
দু'টি পথ অবারিত, আমন্ত্রণে প্রকট চটুল—
গলায় বিশ্বস্ত ক্ষুর কিংবা অলৌকিক বিশ্বাসের
রাজ্যে শুধু অন্ধের স্বভাবে বিচরণ, সায় দেয়া
কবন্ধের শাস্ত্রের শাসনে, পরচুলা খ'সে পড়া
ক্রমাগত অনর্থক যুক্তিহীন মাথা নেড়ে-নেড়ে।

ঈশ্বর কি শিউরে ওঠেন মলভাণ্ডে ? উনুনের
কড়াইয়ের তীব্র জ্বালে কুঁকড়ে যান কাগজের মতো ?
যদি বলি প্রবঞ্চনা ঈশ্বরের অন্য নাম তবে
সত্য থেকে সঠিক ক'গজ দূরে আমার সংশয়ী
পদক্ষেপ ? তাহ'লে বিশ্বস্ত ক্ষুর গলায় ছোঁয়ালে
অথবা ক'ফোঁটা বিষ কণ্ঠ বেয়ে নেমে গেলে এই
জঠরের পাকে পাকে, পার্থক্যের কী জটিল সূত্র
উন্মোচিত হবে পরিণামে ?

পুরাকালে

পুরাকালে কে এক বণিক তার সবচেয়ে দামী
মুক্তোটিকে বাগানের মাটির গভীরে
রেখেছিলো লুকিয়ে যেখানে
সূর্যের তিমির-দীর্ণ আলো
পৌঁছেনি কখনো,
হৈমন্তী গাছের পাতা ঝরেনি সেখানে।

তোমাকে পাওয়ার ইচ্ছা সেই
মুক্তোর মতোই জ্বলে আমার ভেতর রাত্রিদিন

আর আমি ভাবি এই সৌন্দর্যকে লালন করার
আশ্চর্য সাহস
কে দিলো আমাকে ?

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

লোকে বলে বাংলাদেশে কবিতার আকাল এখন,
বিশেষতঃ তোমার মৃত্যুর পরে কাব্যের প্রতিমা
ললিতলাবণ্যচ্ছটা হারিয়ে ফেলেছে— পরিবর্তে রুক্ষতার
কাঠিন্য লেগেছে শুধু, আর চারদিকে পোড়োজমি,
করোটিতে জ্যোৎস্না দেখে ক্ষুধার্ত ইঁদুর কী আশ্বাসে
চমকে ওঠে কিছুতেবোঝেনা ফণিমনসার ফুল।

সুধীন্দ্র জীবনানন্দ নেই, বুদ্ধদেব অনুবাদে
খোঁজেন নিভৃতি আর অতীতের মৃত পদধ্বনি
সমর-স্বভাব আজ। অন্যপক্ষে আর ক'টি নাম
ঝড়জল বাঁচিয়ে আসীন নিরাপদ সিংহাসনে,
এবং সম্প্রতি যারা ধরে হাল বহতা নদীতে
তাদের সাধের নৌকো অবেলায় হয় বানচাল
হঠাৎ চড়ায় ঠেকে। অথবা কুসুমপ্রিয় যারা
তারা পচা ফুলে ব'সে করে বসন্তের স্তব।

যেমন নতুন চারা পেতে চায় রোদবৃষ্টি তেম্নি
আমাদেরও অমর্ত্যের ছিল প্রয়োজন আজীবন।
তোমার প্রশান্ত রূপ ঝরেছিলো তাই সূর্যমুখী
চেতনার সৌরলোকে রাজনীতি প্রেমের সংলাপে।

যেন তুমি রাজসিক একাকীত্বে—মধ্যদিনে যবে
গান বন্ধ করে পাখি— কখনো ফেলোনি দীর্ঘশ্বাস,
যেন গ্রীষ্মে বোলপুরে হওনি কাতর কিংবা শুকনো

গলায় চাওনি জল— অথবা শমীর তিরোধানে
তোমার প্রোজ্জ্বল বুক হয়নিকো দীর্ণ কিংবা যেন
মোহন ছন্দের মায়ামৃগ করেনি ছলনা কোনো --
এমন মূর্তিতে ছিলে অধিষ্ঠিত সংখ্যাহীন প্রাণে।
গোলাপের তীক্ষ্ণ কাঁটা রিক্তের সত্তার নীলিমাকে
ছিঁড়েছিলো, তবু তারও ছিল স্নানাহার, চিরুনীর
স্পর্শ ছিলো চুলে, ছিল মহিলাকে নিবেদিত প্রাণ।

আমার দিনকে তুমি দিয়েছ কাব্যের বর্ণচ্ছটা
রাত্রিকে রেখেছো ভ'রে গানের স্ফুলিঙ্গে, সপ্তরথী
কুৎসিতের ব্যূহ ভেদ করবার মন্ত্র আজীবন
পেয়েছি তোমার কাছে। ঘৃণার করাতে জর্জরিত
করেছি উন্মত্ত বর্বরের অট্টহাসি কী আশ্বাসে।

প্রতীকের মুক্ত পথে হেঁটে চলে গেছি আনন্দের
মাঠে আর ছড়িয়ে পড়েছি বিশ্বে তোমারই সাহসে
অকপট নাস্তিকের সুরক্ষিত হৃদয় চকিতে
নিয়েছো ভাসিয়ে কতো অমলিন গীতসুধারসে।
ব্যাঙডাকা ডোবা নয়, বিশাল সমুদ্র হ'তে চাই
এখনো তোমারই মতো উড়তে চেয়ে কাদায় লুটিয়ে
পড়ি বারবার, ভাবি অন্ততঃ পাঁকের কোকিলের
ভূমিকায় সফলতা এলে কিছু সার্থক জনম।

পিতার প্রতিকৃতি

'কখনো নদীর স্রোতে মৃত গাধা
ভেসে যেতে দেখে সন্ধ্যায়,
দেখেছি একদা যারা হৈ-চৈ ক'রে যুদ্ধে
গেছে তাদের ক'জন

মহৎ স্বপ্নের শব কাঁধে নিয়ে হেঁটে-হেঁটে
ক্লান্ত হ'য়ে ফের
স্বগৃহে এসেছে ফিরে। গোবিন্দলালের পিস্তলের
ধোঁয়ায় রোহিণী আর একটি যুগের অন্তরাগ
মিশে যেতে দেখেছি আমরা'—ব'লে
পিতা থামলেন কিছুক্ষণ।

তিনি ভোরে খাচ্ছিলেন রুটি আর স্মৃতির তিতির
পুরানো চেয়ারে ব'সে। রোদ্দুরের অরেঞ্জ স্কোয়াশে
ভিজিয়ে প্রবীণ কণ্ঠ বল্লেন জনক :
'আমি তো বেঁচেছি ঢের খেয়ে-দেয়ে
ভালো থেকে অশেষ কৃপায়
তাঁর, কতো বছরের রৌদ্রজলে ক্ষ'য়ে গেছে
অস্তিত্বের ধার
আর কে না জানে প্রকৃত দীর্ঘায়ু যিনি
অনেক বিচ্ছেদ মৃত্যু তার মনে প্রেতের ছায়ার
মতো ঝুলে থাকে আজীবন। শৈশবের
অশেষ সন্ধান তাকে টেনে আনে জনশূন্যতার
নেউল-ধূসর তীর্থে, যেখানে কুয়োর জলে
সত্তার নিটোল মুখ দেখার আশায়
যেতে হয়— যেখানে দরোজা বন্ধ, বারান্দায়
পাখির কংকাল,
গোলাপের ছাই প'ড়ে আছে
একটি বাতিল জুতো বিকেলের রোদের আদরে
হেসে উঠে বলের মতন নেচে নেচে নিরিবিলি
ফুলের জগতে চ'লে যায়
এবং একটি ঘোড়া চমকিত বালকের আকাঙ্ক্ষার ঘ্রাণে
মত্ত হ'য়ে ছুটে যায় দলছাড়া মেঘের তল্লাশে,
সহসা খিঁচিয়ে মুখ ছিঁড়ে নেয় অন্তগামী
সূর্যটির মাংস একতাল।

'বেঁচে আছি বহুদিন তবু পৃথিবীকে
এখনো রহস্যময় মনে হয়···আর শোনো
ভাবতে পারি না
কোনোদিন থাকবো না এখানে, চেয়ারে ব'সে
ঝিমাবো না
ভোরের রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে কোনোদিন।

'তখন থাকবে তুমি আমার সন্তান
—দীর্ঘজীবী হও তুমি,
তোমার কণ্ঠে আঙুলের উষ্ণ রক্তে ঘন ঘন
আমার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলি
এক ঝাঁক হাঁসের মতোই জানি
নিপুণ সাঁতার কেটে তোমাকে জোগাবে স্বপ্ন অনিদ্রার রাতে—'
—ব'লে তিনি মুগ্ধ চোখে ফেরালেন মুখ
অতীতের দিকে,
তখন রাসেল রিল্কে বৃদ্ধ পিকাসোর
নাম জানেন না ভেবে
পারিনি করুণা করতে বয়েসী পিতাকে ॥

দুপুরে মাউথ অর্গান

উন্মত্ত বালক তার মাউথ অর্গানে দুপুরকে
চমকে দিয়ে সন্দেহপ্রবণ কিছু মানুষ ব্যতীত
দালান পুলিশ গাড়ি চকিত কুকুর অ্যাসফল্ট
রেস্তোরাঁকে বানালো দর্শক। ট্রাফিক সিগন্যালের
সবুজ বাতিটা ফের নতুন আশার মতো ঝল-
মল জলে, কয়েকটি সম্ভ্রান্ত মোটর পাশাপাশি
হঠাৎ হরিণ হতে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে বুঝি
রোদচেরা সুরের গমকে।

এভেন্যুর ফুটপাতে

উন্মত্ত বালক নেই, মাউথ অর্গান নাচে শুধু
দূরে-কাছে বাতাসের ঝঙ্কৃত সঙ্গতে। দুপুরের
রৌদ্রের বর্ষায় লোকগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠায় :
প্রত্যেকটি মানুষকে মনে হলো স্বপ্নে-ভেসে-ওঠা
দ্বীপের মতন, লুপ্ত স্মৃতির সন্ধানে চমকিত ;
সুরের হীরক দ্যুতি ঝলসিত বুকের শ্লেষ্মায়
মগজের কোষে। ফুটপাতে শুয়ে-শুয়ে সিংহমুখো

কুষ্ঠরোগী আকাশে দুচোখ রাখে, স্বপ্ন ছাখে, ছাখে
রঙিন পাখির কতো নরম শরীর ভেসে যায়,
বাতাসে ছড়ায় রঙ। কখনো ভাবেনা তারা কবে
ট্রেনের চাকার তলে কে রাখলো দুঃস্বপ্ন-মথিত
মাথা তার, জানে শুধু অফুরন্ত ওড়ার আকাশ

বালকের অর্গানের সুর ঝরে ত্রিতল দালানে,
রঙমাখা ক্লান্ত ঠোঁটে, নিঃশেষিত ফলের ঝুড়িতে
পথে বীট পুলিশের পোশাকের নিষ্প্রাণ শাদায়
মোটরের মসৃণ শরীর আর ব্যাঙ্কের দেয়ালে
ফুটপাতে পরিত্যক্ত বাদামের উচ্ছিষ্ট খোসায়
পকেটমারের ক্ষিপ্র নিপুণ আঙুলে, তিনজন
গুণ্ডার টেরিতে শুকনো-মুখ ফেরিঅলার গলায়।

কুষ্ঠরোগী ছাখে তারও ক্ষতের পিছল রসে ঝরে
মত্ত বালকের অর্গানের সুর : ভাবে এই সুর
পারেনা গড়তে তার গলিত শরীরে ভাঁজে ভাঁজে
আবার নতুন মাংস শিল্পের অলীক রসায়নে ?
হ'তে কি পারে না তার বিনষ্ট শরীর ওই দূর
আকাশের পাখিদের মতো ফের সহজ সুন্দর ?

বিধ্বস্ত নীলিমা

যে আমার সহচর

আমি এক কংকালকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটি, প্রাণ খুলে
কথা বলি পরস্পর। বুরুশ চালাই তার চুলে,
বুলোই সযত্নে মুখে পাউডার, দর্জির দোকানে নিয়ে তাকে
ট্রাউজার, শার্ট, কোট ইত্যাদি বানিয়ে ভদ্রতাকে
সঙ্গীর ধাতস্থ করি; দু'বেলা এগিয়ে দিই নিজে
প্রত্যহ যা খাই তাই। কখনো বৃষ্টিতে বেশি ভিজে
এলে ঘরে মাথাটা মুছিয়ে তপ্ত চায়ের পেয়ালা
রাখি তার টেবিলে সাজিয়ে আর শোনাই বেহালা

মধ্যরাতে বন্ধ ঘরে। মাঝে-মাঝে তাকে হৈ-হৈ রবে
নিয়ে যাই বন্ধুদের গুলজার আড্ডার উৎসবে।
সেখানে সে বাক্যবীর, দর্শনের অলিগলি ঘুরে
শোনায় প্রচুর কথামৃত, সাহিত্যের অন্তঃপুরে
জলকেলি ক'রে তার বেলা যায়, কখনো বা ফের
"শোনো বন্ধুগণ, আত্মাটা নিশ্চয় দামী পাথরের
বাক্স নয়,···সংশয়ের কালো জলে পারবে কি ভেসে
যেতে এই আত্মার পিছল বয়া চেপে নিরুদ্দেশে ?
পাবে তীর কোনোদিন ?"—ইত্যাকার চকিত ভাষণ
দিয়ে সে-ও প্রগল্‌ভ আড্ডাকে করে প্রভূত শাসন।

গলির খেলুড়ে ছেলে যে আনন্দে কাগজের নৌকো
ছেড়ে দেয় রাস্তা-উপচানো জলে কিম্বা কিছু চৌকো
ডাক টিকিটের লোভে পিয়নের ব্যাগের ভিতর
দৃষ্টি দেয়— তারই খুশি কংকালের দুটি যাযাবর
চোখ ধ'রে রাখে। তারপর অকস্মাৎ, "মনে আছে
হাতের বইটা ফেলে রেখে বারান্দায় খুব কাছে
টেনে নিয়েছিলে কাকে ? মনে পড়ে সে কার ফ্রকের
অন্তরালে উন্মীলিত হিরণ্ময় মসৃণ ত্বকের

অন্তরঙ্গতায় তুমি রেখেছিলে মুখ ? মনে পড়ে
গোধূলিতে কৌমার্য হরণ সেই কৈশোরের ঘরে ?”
—বলে সে কৌতুকী উচ্চারণে, যে আমার সহচর,
রয়েছে যে রৌদ্রজলে পাশাপাশি ছত্রিশ বছর।

আমি এক কংকালকে সঙ্গে নিয়ে চলি দিনরাত
অসংকোচে, আতঙ্কের মুখোমুখি কখনো হঠাৎ
তাকে করি আলিঙ্গন, প্রাণপণে ডাক-নামে ডাকি
দাঁড়িয়ে সত্তার দ্বীপে নি-শিকড়, একা, আর ঢাকি
ভীত মুখ তারই হাতে। যে কংকাল বান্ধব আমার
তাকে নিয়ে গেছি নিজের প্রিয়তমার কাছে আর
অকাতরে দয়িতার তপ্ত ঠোঁটে কামোদ চুম্বন
আঁকতে দিয়েছি সঙ্গীটিকে। কী যে নিবিড় বন্ধন
দু'জনের অস্তিত্বের গ্রন্থিল জগতে, বুঝি তাই
ঘৃণায় পোড়াই তাকে, কখনো হৃদয়ে দিই ঠাঁই।

শৈশবের বাতি-অলা আমাকে

সর্বাঙ্গে আঁধার মেখে কী করছো এখানে খোকন ?
চিবুক ঠেকিয়ে হাতে, দৃষ্টি মেলে দূরে প্রতিক্ষণ
কী ভাবছো ব'সে ?
হিজিবিজি কী আঁকছো ? মানসাঙ্ক ক'ষে
হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছো ? দেখছো কি কতটুকু খাদ
কতটুকু খাঁটি এই প্রাত্যহিকে, ভাবছো নিছাদ
ঘরে থাকা দায়, নাকি বইপত্রে ক্লান্ত মুখ ঢেকে
জীবনের পাঠশালা থেকে
পালানোর চিন্তাগুলো ভ্রমরের মতো
মনের অলিন্দে শুধু ঘোরে অবিরত ?

থাক, থাক —
মিথ্যে আর বাজিওনা দুশ্চিন্তার ঢাক।
নীলের ফরাশে গ্যাখো বসেছে তারার মাইফেল আজো, শোনো
কী একটা পাখি ডেকে ওঠে না-না হয়নি এখনো
অত বস্তাপচা এই সব। লজ্জার কিছুই নেই,
গ্যাখো-না খুঁটিয়ে সব আর গ্যাখো এই
লণ্ঠনের আলো, সম্মোহনে যার কল্পনার ওড়াতে ফানুস,
পোড়াতে আতশবাজি আনন্দের খুব,
আশ্চর্যের হ্রদে দিতে ডুব।
করেছো কামনা যাকে প্রতিদিন সন্ধেবেলা, আমি সেই আজব মানুষ।

তোমার পাড়ায় আজ বড়ো অন্ধকার। সম্ভবত
বাতিটা জ্বালাতে ভুলে গেছ, আমি অভ্যাসবশতঃ
কেবলি আলোর কথা বলে ফেলি। মস্ত উজবুক
এ লোকটা— ব'লে দাও দ্বিধাহীন। ভয় নেই, দেখাবোনা মুখ
ভুলেও কস্মিনকালে। তোমরা কি অন্ধকার-প্রিয়?
চলি আমি, এই লণ্ঠনের আলো যে চায় তাকেই পৌঁছে দিও॥

জনৈক সহিসের ছেলে বলছে

ঘোড়ার নালের মতো চাঁদ
ঝুলে আছে আকাশের বিশাল কপাটে, আমি একা
খড়ের গাদায় শুয়ে ভাবি
মুমূর্ষু পিতার কথা, যার শুক্‌নো প্রায়-শব প্রায়-অবাস্তব
বুড়োটে শরীর
কিছুকাল ধ'রে যেন আঠা দিয়ে সাঁটা
বিছানায়। গতায়ু হবেন যিনি আজ কিম্বা কাল,
অথবা বছর ঘুরে, আপাতত ভাবছি তাঁকেই,
তাঁকেই ভাবছি যিনি ঘোড়াকে জরুর মতো ভালোবেসেছেন

আজীবন। মুমূর্ষু পিতার চোখে তরুণ ঘোড়ার
কেশরের মতো মেঘ জমে প্রতিক্ষণ। মাঝে-মাঝে
তাঁকে কেন যেন
দুর্বোধ্য গ্রন্থের মতো মনে হয়, ভাষা যার আকাশ-পাতাল
এক করলেও, মাথা খুঁড়ে মরলেও
এক বর্ণ বুঝিনা কখনও।

"জকির শার্টের মতো ছিল দিন একদা আমারও,
রেসের মাঠের সব কারচুপি নখের আয়নায়
সর্বদা বেড়াতো ভেসে। প্রতিদিন গলির দোকানে
ইয়ার বন্ধুর সাথে চায়ের অভ্যস্ত পেয়ালায়
দিয়েছি চুমুক সুখে। বিড়ির ধোঁয়ায় নানারঙ
পরীরা নেচেছে ঘুরে আর অবেলায়
কোথাও অশেষ স্বপ্ন ভাড়া পাওয়া যাবে ভেবে কতো
অলিগলি বেড়িয়েছি চ'ষে আর রাতের বাতাসে
উড়িয়ে রুমাল হেসে শত্রুতা, ব্যর্থতা ইত্যাদিকে

কাফন পরিয়ে
আপাদমস্তক
'বলো তো তোমরা কেউ স্বপ্ন ভাড়া দেবে'—
ব'লে তীব্র কণ্ঠস্বরে মাথায় তুলেছি পাড়া, ভাগ্যদোষে পাইনি উত্তর॥
"রাজা-রাজড়ার দিন নেই আর ছাপার হরফে
কত কিছু লেখা হয়, কানে আসে। ছোটো-বড়ো সব
এক হয়ে যাবে নাকি আগামীর সখের নাটকে।
বর্তমানে এ দেশের স্ত্রী-পুরুষ সাপের পাঁচ পা
হঠাৎ দেখেছে যেন। দিনগুলি হিস্টিরিয়া রোগী"—

কখনও মুমূর্ষু পিতা ঘোড়ার উজ্জ্বল পিঠ ভেবে
সস্নেহে বুলোন হাত অতীতের বিস্তৃত শরীরে।
মাঝে-মাঝে গভীর রাত্তিরে

দেখেন অদ্ভুত স্বপ্ন : কে এক কৃষ্ণাঙ্গ ঘোড়া উড়িয়ে কেশর
পেরিয়ে সুদূর
আগুন রঙের মাঠ তাঁকে নিতে আসে।

অথচ আমার স্বপ্নে রহস্যজনক ঘোড়া নয়,
কতিপয় চিমনি, টালি, ছাদ, যন্ত্রপাতি, ফ্যাক্টরির
ধোঁয়ার আড়ালে ওড়া পায়রার ঝাঁক
এবং একটি মুখ ভেসে ওঠে, আলোময় মেঘের মতোই
একটি শরীর
আমার শরীরে মেশে, আমি স্বপ্নে মিশি,
রুপালি স্রোতের মতো স্বপ্ন কতিপয়
আমার শরীরে মেশে, আমি মিশি, স্বপ্ন মেশে, আমাকে নিয়ত
একটু একটু ক'রে স্বপ্ন গিলে ফেলে।

কেমন ক'রে শেখাই তাকে

কেমন ক'রে শেখাই তাকে
ছোট্ট অবুঝ শিশুটাকে
জ্বালতে তারার বাতি,
যখন কিনা আমরা নিজে
অন্ধকারে শুধুই ভিজে
কাদা ছোঁড়ায় মাতি !

কেমন ক'রে শেখাই তাকে
ছোট্ট অবুঝ শিশুটাকে
বলতে সত্য কথা,
যখন কিনা মিথ্যা থেকে
আমরা নিজে শিখছি ঠেকে
চতুর কথকতা !

কেমন ক'রে শেখাই তাকে
ছোট্ট অবুঝ শিশুটাকে
বাসতে শুধুই ভালো,
যখন কিনা রাত্রিদিন
আমরা নানা অর্বাচীন
হচ্ছি ঘৃণায় কালো।

কেমন ক'রে বলি তাকে
ছোট্ট অবুঝ শিশুটাকে
'আস্থা রাখো ওহে!'—
যখন কিনা বিশ্ব জুড়ে
আমরা শুধু মরছি ঘুরে
নাস্তিকতার মোহে।

বাড়ি

নিজের বাড়িতে আমি ভয়ে ভয়ে হাঁটি, পাছে কারো
নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে। যদি কারো তিরিক্ষি মেজাজ
জ্বলে ওঠে ফস্ করে যথাবিধি, সেই ভয়ে আরো
জড়োসড়ো হ'য়ে থাকি সারাক্ষণ আমার যে-কাজ
নিঃশব্দে করাই ভালো। বাড়িতে বয়স্ক যারা, অতি
পুণ্যলোভী, রেডিয়োতে শোনে তারা ধর্মের কাহিনী।
যুবকেরা আড্ডাবাজ, মেয়েরা আহ্লাদী প্রজাপতি,
মক্ষিরাণী। সংসারে কেবলি বাড়ে শিশুর বাহিনী।

মেথরপাড়ায় বাজে ঢাক-ঢোল, লাউডস্পীকারে
কান ঝালাপালা আর আজকাল ঠোঙায় সংস্কৃতি
ইতস্ততঃ বিতরিত, কমৃতি নেই কালের বিকারে।
বুকে শুধু অজস্র শব্দের ঝিলিমিলি। যে-সুকৃতি

জমেনি কিছুই তার কথা ভেবে মাথা করি হেঁট,
ঘুমায় পুরোনো বাড়ি, জলে দূরে তারার সেনেট।

প্রভুকে

প্রভু, শোনো, এই অধমকে যদি ধরাধামে পাঠালেই,
তবে কেন হায় করলে না তুমি তোতাপাখি আমাকেই?
দাঁড়ে ব'সে-ব'সে বিজ্ঞের মতো নাড়তাম লেজখানি,
তীক্ষ্ণ আদরে ঠোঁট দিয়ে বেশ খুঁটতাম দানাপানি।
মিলতো সুযোগ বন্ধ খাঁচায় বাঁধা বুলি কুড়োবার,
বইতে হতো না নিজস্ব কথা বলবার গুরুভার।

তিনটি ঘোড়া

তিনটি শাদা ঘোড়া বাতাসে দেয় লাফ,
বন্য কেশরের জ্বলছে বিদ্যুৎ।
চোখের কোণে কাঁপে তীব্র নরলোক,
তিনটি শাদা ঘোড়া বাতাসে দেয় লাফ।

আকাশে মেঘদল সঙ্গ চায় বুঝি,
মাটির নির্ভর উঠছে দুলে শুধু।
বাতাসে ঝলমল মুক্ত তলোয়ার,
তিনটি তলোয়ার আঁধারে ঝলসায়।

স্বপ্নহীনতায় স্বকাল হলো ধু-ধু,
স্বস্তি নেই খাটো মাঠের মুক্তিতে।
খুরের ঘায়ে ওড়ে অভ্র চৌদিকে,
তিনটি শাদা ঘোড়া স্বপ্ন তিনজন।

শূন্যে মেঘদল যাচ্ছে ডেকে দূরে,
মেঘের নীলিমায় দেয় না ধরা তারা;

লক্ষ গোলাপের পাপড়ি ওঠে ভেসে,
অন্ধকারে যেন মুখের রেখাগুলো।

তিনটি ঘোড়া বুঝি সাহস হৃদয়ের,
ত্রিকাল কেশয়ের শিখায় জাগ্রত।
শূন্য পিঠে ভাসে মুকুট উজ্জ্বল,
তিনটি শাদা ঘোড়া বাতাসে দেয় লাফ

কখনো আমার মাকে

কখনো আমার মাকে কোনো গান গাইতে শুনিনি।
সেই কবে শিশু রাতে ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে
আমাকে কখনো ঘুম পাড়াতেন কিনা আজ মনেই পড়ে না।

যখন শরীরে তার বসন্তের সম্ভার আসেনি,
যখন ছিলেন তিনি ঝড়ে আম-কুড়িয়ে বেড়ানো
বয়সের কাছাকাছি হয়তো তখনো কোনো গান
লতিয়ে ওঠেনি- মীড়ে মীড়ে দুপুরে সন্ধ্যায়,
পাছে গুরুজনদের কানে যায়। এবং স্বামীর

সংসারে এসেও মা আমার সারাক্ষণ
ছিলেন নিশ্চুপ বড়ো, বড়ো বেশি নেপথ্যচারিণী। যতদূর
জানা আছে, টপ্পা কি খেয়াল তাঁকে করেনি দখল
কোনোদিন। মাছ কোটা কিংবা হলুদ বাটার ফাঁকে
অথবা বিকেলবেলা নিকিয়ে উঠোন
ধুয়ে মুছে বাসন-কোসন
সেলাইয়ের কলে ঝুঁকে, আলনায় ঝুলিয়ে কাপড়,
ছেঁড়া শার্টে রিফু কর্মে মেতে
আমাকে খেলার মাঠে পাঠিয়ে আদরে

অবসরে চুল বাঁধবার ছলে কোনো গান গেয়েছেন কিনা
এতকাল কাছাকাছি আছি তবু জানতে পারিনি।

যেন তিনি সব গান দুঃখ-জাগানিয়া কোনো কাঠের সিন্দুকে
রেখেছেন বন্ধ ক'রে আজীবন, এখন তাদের
গ্রন্থিল শরীর থেকে কালেভদ্রে সুর নয়, শুধু
ন্যাপথলিনের তীব্র ঘ্রাণ ভেসে আসে।

নিরালোকে দিব্যরথ

একটা চাদর

দেখছি ক'দিন ধ'রে গৃহিণীর হাতে তৈরি হচ্ছে অনুপম
একটা চাদর।
সততা এবং অনলস যে অধ্যবসায়
শিল্পীকে সফল করে তারই যুগ্মতায়
সে একটা চাদর সেলাই
করলো ক'দিন ধ'রে। একদিন উদার মাঠে যে-কনক ফসলের নাচ,
চাঁদের বক্রতা ঘেঁষা বনের যে-শ্যামলিমা আর
সর্ষে ক্ষেতে চঞ্চল মেয়ের মতো ছোট্ট প্রজাপতির যে-রঙ,
স্বপ্নে-দেখা অলৌকিক ফুলের পাপড়ির
যে-নরম— সব কিছু নির্মল তরঙ্গ হয়ে অলক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো
সমগ্র সত্তায় তার— সেই সব আশ্চর্য বর্ণালী নিয়ে একটা চাদর
ছুঁয়েছে শিল্পের সীমা, দেখলাম মুগ্ধতায়। গাঢ়

রাত্তিরে তন্ময় হয়ে চাদরকে যে দিচ্ছে, শিল্পের মুক্তি
আর যেটা ক্রমশ শিল্পিত হচ্ছে, উভয়ে কেমন
নিবিড় একাত্ম, যেন মঞ্চের আলোয় নৃত্য আর
নর্তকীর মধ্যে কোনো থাকে না তফাৎ। দেখলাম,
সে আর চাদর, উভয়কে সযত্নে বুনছে কেউ সূক্ষ্ম তাঁতে।

চাদরটা উল্টে পাল্টে দেখলো সে, দেখলো নিজের
কারুকাজ, তারপর ঘুমন্ত মেয়ের চার বছরের সেই
একরত্তি শরীরে ছড়িয়ে মৃদু হেসে দাঁড়ালো শয্যার
একপাশে। দেখলাম, সুন্দর চাদর নয়, একটি মায়ের
স্নেহ-জ্যোৎস্না শরতের নিষ্কলুষ দিনের মতোই
নিবিড় জড়িয়ে গেলো সন্তানের নিমগ্ন সত্তায়, চুমো হ'য়ে
চাদরটা রইলো ছুঁয়ে আমাদের সন্তানের সমস্ত শরীর।

সে জানে অশেষ অনুরাগে বোনা এই আবরণ
কন্যাকে করবে রক্ষা অপদেবতার ছায়া থেকে,

দৈত্যের নিশ্বাস থেকে আর সেই চাদর একটা
প্রাচীরের মতো
থাকবে দাঁড়িয়ে শুভ আর অশুভের
মধ্যে প্রতিক্ষণ। দেখি প্রগাঢ় শান্তিতে
ঘুমোচ্ছে মেয়েটা,
তোমরা ঘুমোতে দাও তাকে—

মাছ

মাছ তুমি প্রতিপলে করতলে হচ্ছো ম্লান। যতদূর জানি,
জল ছেড়ে শামুকের স্পর্শ ছেড়ে হাতের চেটোয়,
রোদের সোনালি কাঁটাতারে
শুয়ে থেকে মাথাটা তোমার
দিলো চাকদানা।

মেঘের গোঘোর নেই একটু আকাশে, মাছ তুমি
হচ্ছো ম্লান; নৌকো যাচ্ছে রোদের ভেতর দিয়ে ফুলো
পাল তুলে। চোখ দেখি অপলক, হয়তো সেখানে
এখন জলজ স্মৃতি স্থিরচিত্র। মাছ তুমি সাঁতার জানো না
হাতের ডাঙায়, তবু সকালবেলার তারা হ'য়ে
আছো স্বপ্নে, দুঃস্বপ্নে অংশত। জীবনের প্রতিষ্ঠিত
সোনালি কামানি থেকে যাচ্ছো স'রে। এখন তোমাকে
অথৈ শূন্যতায়, নীলিমায়
কিছুতেই ওড়ানো যাবেনা
ওগো মাছ, হাতের ডাঙায়-পড়া মাছ।

কোথাকার খোয়াইল্যা পাখি
মগজে নোয়ানো
জল-ছোঁয়া তীক্ষ্ণ কঞ্চিটায় বসে: বুঝি মাছরাঙা হ'য়ে এলো
তোমার জীবনহর। দেখছো মরীয়া হ'য়ে, খোলা

চোখে চমকালো চান্‌নি উথ্‌যালা এবং শরীরের
নক্সী ত্বক ক্রমাগত হারাচ্ছে তীক্ষ্ণতা।
মাছ তুমি ডগা ডগা রোদের ভেতরে আছো, আমি
তোমার ভেতরে যাই, অকাতরে হই
রঙিন ঘুড়ির মতো ত্বক, হই কারুকাজময় শ্বেত কাঁটা
ওগো মাছ, হে বন্ধু আমার।
প্রথম যখন হাতে তুলে নিয়েছিলাম তোমাকে
আলগোছে— প্রতিদিন কত কিছু তুলি : বইপত্র, ছেঁড়া মোজা,
জুতোর কালির ডিবে, আলপিন, শার্টের বোতাম ; এরকম
অনেক কিছুই তুলি কাজে বা অকাজে—
মনে হয়েছিলো যেন তুমিও তেমনি কোনো জিনিস বস্তুত।

আপাদিন সিল্কের মতো চামড়ার আদরে চমকিত
দেখলাম তসবী-দানা চোখ নিয়ে চেয়ে আছো রোদের ভেতরে,
আমারই চোখের দিকে, আছো হাতের জায়নামাজে, স্থির,
অনবোলা। অকস্মাৎ আমাকে বিঁধলে তুমি মাছ, ওগো মাছ,
হে বন্ধু আমার, অলৌকিক বঁড়শিতে।

নির্জন কিনারে হাঁটু গেড়ে কাটাল পাখির বুলি শুনি, ভাবি—
তোমাকে ছাড়বো আমি নাকি তুমি আমাকে দয়ালু ?

বংশধর

যেদিন আমার পিতামহের কাফন-মোড়া শরীরের ওপর
নশ্বর নক্সার মতো চাংবাঁশটায় পুঞ্জ পুঞ্জ শোক হয়ে কেবলি
ঝ'রে পড়ছিলো কালো মাটির দলা,
তখনও আমি পৃথিবীর কেউ নই।

পিতামহের ডাক নদীর এক তীর থেকে অন্য তীরে
সহজে করতো যাত্রা, শুনেছি।

তাঁর সেই গম্‌গমে ডাকে কবিতার সুর যেতো মিশে—
এমন কোনো কিংবদন্তীর জন্ম হয়নি আমাদের পরিবারে।

পিতামহীর কথা যখনই ভাবি, শুধু একটি দৃশ্য
ভেসে ওঠে পুরোনো দিনের আরশি ছেড়ে বর্তমানের আয়নায়:
ছায়াচ্ছন্ন ঘরে বার্নিশ-চটা পালঙ্কে এলিয়ে থাকা
বর্ষীয়সী এক মহিলা, চোখ দুটো ভরা দুপুরে
হারিকেনের আলোর মতো নিষ্প্রভ।
তাঁর সেই অনুজ্জ্বল এক-জোড়া চোখ
কোনোদিন কবিতার পঙ্‌ক্তির আভায় জ্বলজ্বলে
হয়েছিলো কিনা, জানি না।

আমার মাতামহ সকালের চঞ্চল বেলায় বারংবার
বুক-পকেট থেকে চেন-বন্দী ঘড়িটা দেখতেন
আর দশটার আগেই ছাতা হাতে ছুটতেন
কাচারির দিকে— সেখানে প্রায়-অনুল্লেখ্য কোনো
কাজ করতেন তিনি। একটা টাইপরাইটার ছিল তাঁর;
মাঝে-মাঝে দেখতাম কয়েকটি অভিজ্ঞ আঙুল
ব্যালে নর্তকের মতো নেচে চলেছে কী-বোর্ডে।
যতদূর জানি, মাতামহের সেই অতি-পুরাতন শব্দসমুদয়
কাব্যের পাড়ার কেউ ছিলো না।

আমার মাতামহী, সবার অলক্ষ্যে যিনি শাদা অথচ সুদীর্ঘ
চুল আঁচড়াতেন মধ্যদিনে কাঠের কাঁকুই দিয়ে আর
সন্ধ্যা হ'লেই মুরগীর বাচ্চাগুলোকে দর্বায় পোরার জন্যে
অস্থির পায়ে করতেন ছুটোছুটি— যত আন্দোলিত হতেন আমার
মাতামহের ডাকে ততটা আর কিছুতেই নয়।
বুঝি তাই কবিতার ডাক তাকে কখনও কাছে টানেনি।

আমার পিতা, সেই অমিতবিক্রম সিংহপুরুষ,
জীবনের দুটো শিং ধ'রে লড়তে লড়তে নিজেকে যিনি

ক্লান্ত করেছিলেন, যিনি ভালোবাসতেন হেঁটে যেতে
সুঘ্রাণ ভরা শস্য-ক্ষেতের আলের ওপর,
কোনোদিন পা বাড়াননি কাব্যের প্রান্তরে।
না, তাঁরা কেউ পা রাখেননি নিঃসঙ্গতার উথালপাথাল
সমুদ্র-ঘেরা কবিতার দ্বীপপুঞ্জে। কিন্তু ঐ পুণ্যজনের
স্মৃতির অজর শরীরে
কবিতার সোনালি রুপালি জল ছিটোচ্ছে
তাঁদেরই এক ফ্যাকাশে বংশধর
সময়ের হিংস্র আঁচড়ে ক্রমাগত জর্জর হ'তে হ'তে।

টেলেমেকাস

তুমি কি এখনো আসবে না? স্বদেশের পূর্ণিমায়
কখনো তোমার মুখ হবে নাকি উদ্ভাসিত, পিতা,
পুনর্বার? কেন আজো শুনিনা তোমার পদধ্বনি?
এদিকে প্রাকারে জমে শ্যাওলার মেঘ, আগাছার
দৌরাত্ম্য বাগানে বাড়ে প্রতিদিন। সওয়ারবিহীন
ঘোড়াগুলো আস্তাবলে ভীষণ ঝিমোয়, কুকুরটা
অলিন্দে বেড়ায় শুঁকে কতো কী-যে, বলেনা কিছুই।

নয়কো নগণ্য দ্বীপ সুজলা সুফলা শস্যশ্যাম
ইথাকা আমার ধনধান্যে পুষ্পে ভরা। পিতা, তুমি
যেদিন স্বদেশ ছেড়ে হ'লে পরবাসী, ভ্রাম্যমাণ,
সেদিন থেকেই জানি ইথাকা নিষ্পত্র, যেন এক
বিবর্ণ গোলাপ। আমি একা কৈশোরের জলজলে
প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কোন্ কাক-তাড়ুয়ার মূর্তি দেখে
ভুলে গেছি হাসি। 'কেন আপনার ঠোঁটের দিগন্তে
হাসির হরিণ-শিশু পালিয়ে বেড়ায় অবিরত?'—
কখনো করেন প্রশ্ন ধীমান প্রবীণ সভাসদ।

বিদেশীরা রাত্রিদিন করে গোল ইথাকায় ; কেউ
সযত্নে পরখ করে বর্শার ফলার ধার, শূন্য
মদের রঙিন পাত্র ছুঁড়ে ফেলে কেউ, লাথি ছোঁড়ে,
কেউ বা উত্ত্যক্ত করে পরিচারিকাকে। মাঝে-মাঝে
কেবলি বাড়ায় হাত প্রোষিতভর্তৃকা জননীর
দিকে, যিনি কী-একটা বুনছেন স্বচারু কাপড়ে
দিনে, রাতে খুলছেন সীবনীর শিল্পে। কোলে তাঁর
সুতোর বলের সাথে খেলা করে মোহন অতীত।
লুকিয়ে কাঁদেন তিনি ছড়িয়ে জলজ দৃষ্টি ধু-ধু
সমুদ্রের প্রতি, কালো বেড়ালের মতো নিঃসঙ্গতা
তাঁর শয্যা, অস্থিমজ্জা জুড়ে রয় আজো সর্বক্ষণ।

সবুজ শ্যাওলা-ঢাকা পুকুরেও ছুঁড়ে দিলে ঢিল,
সেখানে চকিতে ওঠে ঢেউ আর বাতাসের ডাকে
এমন-কি পত্রহীন গাছও দেয় সাড়া, কিন্তু এই
আমার মুখের রেখা সর্বদাই নির্বিকার, তাই
পালিয়ে বেড়াই ভয়ে, পাছে কেউ জনসমাবেশে
পৌরপথে নানাবিধ প্রশ্নের পেরেক ঠুকে ঠুকে
আমাকে রক্তাক্ত করে। জানি, এ বয়সে প্রাণ খুলে
হাসাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু ঘরে শত্রু নিয়ে মুখে
হাসির গোলাপ-কুঁড়ি ফোটানো কঠিন। নানা জন
রটায় নানান কথা : শুনি তুমি নাকি মৃত, তুমি
সার্সির সবুজ চুলে বাঁধা পড়ে আছো, বলে কেউ।

কূলে একা ব'সে থাকি। কোথায় ভরসা ? ঘুরে ঘুরে
প্রতিদিন ফিরে আসি অলক্ষ্যে বাড়ির সীমানায় ;
দাঁড়াই যেখানে সিঁড়ি শব্দ ক'রে জানায় চকিতে
এখন বয়স কতো বাড়িটার আর আমি নিজে
আনাচে কানাচে ঘুরি, নিরালম্ব, বিদেশীর মতো।
মনে হয়, ক্রমাগত সশব্দে আমাকে দিচ্ছে কারা

কবরে নামিয়ে শুধু; পাগুলো মাটিতে লেগে লেগে
কেমন নির্বোধ হ'য়ে রয়েছে তাকিয়ে, যেন ওরা
পৃথিবীতে বাস্তবিক হাঁটতে শেখেনি কোনোদিন।

তুমি নেই তাই বর্বরের দল করেছে দখল
বাসগৃহ আমাদের। কেউ পদাঘাত করে, কেউ
নিমেষে হটিয়ে দেয় কনুই-এর গুঁতোয় আবার
'দুধ খাও গে হে খুকুমণি' ব'লে কেউ তালেবর
দাড়িতে বুলোয় হাত। পিপে পিপে মদ শেষ, কতো
ঝলসানো মেষ আর শুয়োর কাবার, প্রতিদিন
ভাঁড়ারে পড়ছে টান। থমথমে আকাশের মতো
সমস্ত ইথাকা, গরগরে জনগণ প্রতিষ্ঠিত
অনাচার, কদাচার ইত্যাদির চায় প্রতিকার।

আমিও বাঁচতে চাই, চাই পড়ো-পড়ো বাড়িটাকে
আবার করাতে দাঁড়। বাগানের আগাছা নিড়ানো
তবে কি আমারই কাজ? বুঝি তাই ঋতুতে ঋতুতে
সাহস সঞ্চয় করি এবং জীবন তুরঙ্গের
বর্ণিল লাগাম ধ'রে থাকি দৃঢ় দশটি আঙুলে।
কখনো এড়িয়ে দৃষ্টি ছুটে যাই অস্ত্রাগারে, ভাবি
লম্পট জোচ্চোর আর ঘাতকের বীভৎস তাণ্ডব
কবে হবে শেষ? সূর্যগ্রহণের প্রহর কাটবে
কবে? জননীর মতো চোখ রাখি সমুদ্রে সর্বদা।

ইথাকায় রাখলে পা দেখতে পাবে রয়েছি দাঁড়িয়ে
দরজা আগলে, পিতা, অধীর তোমারই প্রতীক্ষায়।
এখনো কি ঝঞ্ঝা-হত জাহাজের মাস্তুল তোমার
বন্দরে যাবে না দেখা? অস্ত্রাগারে নেবে না আয়ুধ
আবার অভিজ্ঞ হাতে? তুলবে না ধনুকে টঙ্কার?

নিজ বাসভূমে

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়।
মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়
ঘিরে রয় সর্বদাই। কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে
শিউলিশৈশবে 'পাখী সব করে রব' ব'লে মদনমোহন
তর্কালঙ্কার কী ধীরোদাত্ত স্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক। তুমি আর আমি,
অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর মমতায় লীন,
ঘুরেছি কাননে তাঁর নেচে নেচে, যেখানে কুসুম-কলি সবই
ফোটে, জোটে অলি ঋতুর সংকেতে।

আজন্ম আমার সাথী তুমি,
আমাকে স্বপ্নের সেতু দিয়েছিলে গ'ড়ে পলে পলে,
তাইতো ত্রিলোক আজ সুনন্দ জাহাজ হ'য়ে ভেড়ে
আমারই বন্দরে।

গলিত কাচের মতো জলে ফাৎনা দেখে দেখে রঙিন মাছের
আশায় চিকন ছিপ ধ'রে গেছে বেলা। মনে পড়ে, কাঁচি দিয়ে
নক্সা কাটা কাগজ এবং বোতলের ছিপি ফেলে
সেই কবে আমি 'হাসিখুশি'র খেয়া বেয়ে
পৌঁছে গেছি রত্নদ্বীপে কম্পাস বিহনে।

তুমি আসো, আমার ঘুমের বাগানেও
সে কোন্ বিশাল
গাছের কোটর থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে আসো,
আসো কাঠবিড়ালির রূপে,
ফুল্ল মেঘমালা থেকে চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো ঐরাবত সেজে,
সুদূর পাঠশালার একান্নটি সতত সবুজ
মুখের মতোই দুলে দুলে ওঠো তুমি

বারবার কিম্বা টুকটুকে লঙ্কা-ঠোঁট টিয়ে হ'য়ে
কেমন দুলিয়ে দাও স্বপ্নময়তায় চৈতন্যের দাঁড়।

আমার এ অক্ষিগোলকের মধ্যে তুমি আঁখিতারা।
যুদ্ধের আগুনে,
মারীর তাণ্ডবে,
প্রবল বর্ষায়
কি অনাবৃষ্টিতে,
বারবনিতার
নূপুর নিক্কণে,
বনিতার শান্ত
বাহুর বন্ধনে,
ঘৃণায় ধিক্কারে,
নৈরাজ্যের এলো-
থাবাড়ি চীৎকারে,
সৃষ্টির ফাল্গুনে

হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?
উনিশ শো' বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।
সে-ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হ'লে আমার সত্তার দিকে
কতো নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।
এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি,
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষমাস।
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

এখানে এসেছি কেন? এখানে কী কাজ আমাদের?
এখানে তো বোনাস ভাউচারের খেলা নেই কিম্বা নেই মায়া
কোনো গোল টেবিলের, শাসনতন্ত্রের ভেল্‌কিবাজি,
সিনেমার রঙিন টিকিট
নেই, নেই সার্কাসের নিরীহ অসুস্থ বাঘ, কসরৎ দেখানো
তরুণীর শরীরের ঝলকানি নেই কিম্বা ফানুস ওড়ানো
তা-ও নেই, তবু কেন এখানে জমাই ভিড় আমরা সবাই?

আমি দূর পলাশতলীর
হাড্‌ডিসার ক্লান্ত এক ফতুর কৃষক,
মধ্যযুগী বিবর্ণ পটের মতো ধু-ধু,
আমি মেঘনার মাঝি, ঝড় বাদলের
নিত্য-সহচর,
আমি চটকলের শ্রমিক,
আমি মৃত রমাকান্ত কামারেব নয়ন পুত্তলি,
আমি মাটিলেপা উঠোনের
উদাস কুমোর, প্রায় ক্ষ্যাপা, গ্রাম উজাড়ের সাক্ষী,
আমি তাঁতী সঙ্গীহীন, কখনো পড়িনি ফার্সি, বুনেছি কাপড় মোটা-মিহি
মিশিয়ে মৈত্রীর ধ্যান তাঁতে.
আমি
রাজস্ব দফতরের করুণ কেরানী, মাছি-মারা তাড়া-খাওয়া,
আমি ছাত্র, উজ্জ্বল তরুণ,
আমি নব্য কালের লেখক,
আমার হৃদয়ে চর্যাপদের হরিণী
নিত্য করে আসা-যাওয়া, আমার মননে
রাবীন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিন্যাসে
এবং মেলাই তাকে বাস্তবের তুমুল রোদ্দুরে
আর চৈতন্যের নীলে কতো স্বপ্ন-হাঁস ভাসে নাক্ষত্রিক স্পন্দনে সর্বদা।

আমরা সবাই
এখানে এসেছি কেন ? এখানে কী কাজ আমাদের ?
কোন্ সে জোয়ার
করেছে নিক্ষেপ আমাদের এখন এখানে এই
ফাল্গুনের রোদে ? বুঝি জীবনেরই ডাকে
বাহিরকে আমরা করেছি ঘর, ঘরকে বাহির।

জীবন মানেই
মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো,
জীবন মানেই
ফসলের গুচ্ছ বুকে নিবিড় জড়ানো,
জীবন মানেই
মেঘনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দাঁড় বাওয়া পাল খাটানো হাওয়ায়,
জীবন মানেই
পৌষের শীতার্ত রাতে আগুন পোহানো নিরিবিলি।
জীবন মানেই
মুখ থেকে কারখানার কালি মুছে বাড়ি ফেরা একা শিস দিয়ে,
জীবন মানেই
টেপির মায়ের জন্যে হাট থেকে ডুরে শাড়ি কেনা,
জীবন মানেই
বইয়ের পাতায় মগ্ন হওয়া, সহপাঠিনীর চুলে
অন্তরঙ্গ আলো তরঙ্গের খেলা দেখা,
জীবন মানেই
তালে তালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিলে চলা, নিশান ওড়ানো,
অন্যায়ের প্রতিবাদে শূন্যে মুঠি তোলা,
জীবন মানেই
মায়ের প্রসন্ন কোলে মাথা রেখে শৈশবের নানা কথা ভাবা,
জীবন মানেই
খুকির নতুন ফ্রকে নক্সা তোলা, চারু লেস্ বোনা,

জীবন মানেই
ভায়ের মুখের হাসি, বোনের নিপুণ চুল আঁচড়ানো,
প্রিয়ার খোঁপায় ফুল গোঁজা ;
জীবন মানেই
হাসপাতালের বেডে শুয়ে একা আরোগ্য ভাবনা,
জীবন মানেই
গলির মোড়ের কলে মুখ দিয়ে চুমুকে চুমুকে জলপান,
জীবন মানেই
রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়ানো,
জীবন মানেই
স্ফুলিঙ্গের মতো সব ইস্তাহার বিলি করা আনাচে কানাচে
জীবন মানেই ... ...))

আবার ফুটেছে ছাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হ'য়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়—ফুল নয়, ওরা
শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।

এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রঙ,
যে-রঙ লাগে না ভালো চোখে, যে-রঙ সন্ত্রাস আনে
প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল সন্ধ্যায়—
এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ ঘাট, সারা দেশ
ঘাতকের অশুভ আস্তানা।
আমি আর আমার মতোই বহু লোক
রাত্রিদিন ভূলুণ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ,
কেউ বা ভীষণ জেদী, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া। চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।

বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,

বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের বুক আজ উন্মথিত মেঘনা,
সালামের চোখ আজ আলোকিত ঢাকা,
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।

দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই
জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।

হরতাল
(শহীদ কাদরীকে)

প্রতিটি দরজা কাউন্টার কনুইবিহীন আজ। পা মাড়ানো,
লাইনে দাঁড়ানো নেই, ঠেলাঠেলিহীন;
মুদ্রার রুপালি পরী নয় নৃত্যপরা শিকের আড়ালে
অথবা নোটের তাড়া গাংচিলের চাঞ্চল্যে অধীর
ছোঁয় না দেরাজ। পথঘাটে
তাল তাল মাংসের উষ্ণতা
সমাধিস্থ কর্পূরে বেবাক।
মায়ের স্তনের নিচে ঘুমন্ত শিশুর মতো এ শহর অথবা হাঁদার
ভাবুকের মতো;
দশটি বাঙ্ময় পঙ্‌ক্তি রচনার পর একাদশ পঙ্‌ক্তি নির্মাণের আগে
কবির মানসে জমে যে-স্তব্ধতা, অন্ধ, ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্র

থাবা থেকে গা বাঁচিয়ে বুকে
আয়াতের নক্ষত্র জ্বালিয়ে
পাথুরে কণ্টকাবৃত পথ বেয়ে ঊর্ণাজাল-ছাওয়া
লুকানো গুহার দিকে যাত্রাকালে মোহাম্মদ যে-স্তব্ধতা আস্তিনের ভাঁজে
একদা নিয়েছিলেন ভ'রে,
সে স্তব্ধতা বুঝি
নেমেছে এখানে।

রাজপথ নিদাঘের বেশ্যালয়, স্তব্ধতা সঙিন হ'য়ে বুকে
গেঁথে যায়; একটি কি দুটি
লোক ইতস্তত:
প্রফুল্ল বাতাসে ওড়া কাগজের মতো ভাসমান।

সবখানে গ্যাসোলিন পাইপ বিশুদ্ধ, মানে ভীষণ অলস,
হঠাৎ চমক লাগে মধ্যপথে নিজেরই নিঃশ্বাস শুনে আর
কোথাও অদূরে
ফুল পাপড়ি মেলে পরিস্ফুট শব্দ শুনি,
এঞ্জিনের গহন আড়াল থেকে বহুদিন পর
বহুদিন পর
অজস্র পাখির ডাক ছাড়া পেলো যেন।
সুকণ্ঠ নিবিড় পাখি আজো
এ শহরে আছে কখনো জানিনি আগে
ট্যুরিস্ট দু'চোখ
বেড়ায় সবুজে:
সমাহিত মাঠে
ছেলেদের ছায়ারা খেলছে এক গভীর ছায়ায়।
কলকারখানায়
তেজী ঘোড়াগুলো
পাথুরে ভীষণ;
ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জানালা থেকে সরু
পাইপের মতো গলা বাড়িয়ে সারস এক স্তব্ধতাকে খায়

শহর ঢাকার পথ ফাঁকা পেয়ে কতো কী-যে বানালাম হেঁটে-যেতে যেতে
বানালাম ইচ্ছেমতো : আঙুলের ডগায় হঠাৎ
একটি সোনালি মাছ উঠলো লাফিয়ে,
বড় হ'তে হ'তে
গেল উড়ে দূরে
কোমল উদ্যানে
ভিন্ন অবয়ব
খুঁজে নিতে অজস্র ফুলের দুয়ারে।

হেঁটে-যেতে যেতে
বিজ্ঞাপন এবং সাইনবোর্ডগুলো মুছে ফেলে
সেখানে আমার প্রিয় কবিতাবলীর
উজ্জ্বল লাইন বসালাম ;
প্রতিটি পথের মোড়ে পিকাসো মাতিস আর ক্যাণ্ডিনিস্কি দিলাম ঝুলিয়ে।
চৌরাস্তার চওড়া কপাল,
এভেন্যুর গলি, ঘোলাটে গলির কটি,
হরবোলা বাজারের গলা
পাষাণপুরীর রাজকন্যাটির মতো
নিরুপম সৌন্দর্যে নিথর।

স্তূপীকৃত জঞ্জালে নিষ্ক্রিয় রোদ বিড়ালছানা মৃদু
থাবা দিয়ে কাড়ে
রোদের আদর।
জীবিকা বেবাক ভুলে কাঁচা প্রহরেই
ঘুমায় গাছতলায়, ঠেলাগাড়ির ছায়ায় কিম্বা
উদাস আড়তে,
ট্রলির ওপরে
নিস্তরঙ্গ বাসের গহ্বরে,
নৈঃশব্দের মসৃণ জাজিমে।
বস্তুতঃ এখন

কেমন সবুজ হ'য়ে ডুবে আছে ক্রিয়াপদগুলি
গভীর জলের নিচে কাছিমের মতো শৈবালের সাজঘরে।

চকিতে বদলে গেছে আজ,
আপাদমস্তক
ভীষণ বদলে গেছে শহর আমার।

আসাদের শার্ট

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিম্বা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়।

বোন তার ভায়ের অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায়;
বর্ষীয়সী জননী সে-শার্ট
উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে কতদিন স্নেহের বিন্যাসে

ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি-চূড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচে কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।

আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।

কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হ'য়ে আছে ?

কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হ'য়ে আছে
এখনো আমার মনে ? দেখেছি তো গাছে
সোনালি বুকের পাখি, পুকুরের জলে
শাদা হাঁস। দেখেছি পার্কের ঝলমলে
রোদ্দুরে শিশুর ছুটোছুটি কিম্বা কোনো
যুগলের ব'সে থাকা আঁধারে কখনো।

দেশে কি বিদেশে ঢের প্রাকৃতিক শোভা
বুলিয়েছে প্রীত আভা মনে, কখনো-বা
চিত্রকরদের সৃষ্টির সান্নিধ্যে খুব
হয়েছি সমৃদ্ধ আর নিঃসঙ্গতায় ডুব
দিয়ে করি প্রশ্ন : এখনো আমার কাছে
কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হ'য়ে আছে ?

যেদিন গেলেন পিতা, দেখলাম মাকে—
জননী আমার নির্দ্বিধায় শান্ত তাঁকে
নিলেন্ প্রবল টেনে বুকে, রাখলেন
মুখে মুখ ; যেন প্রিয় ব'লে ডাকবেন
বাসরের স্বরে। এখনো আমার কাছে
সেই দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হ'য়ে আছে।

সন্ধ্যা

কোনো কোনো সন্ধ্যা যুবতীর জলার্ত চোখের মতো
ছলছল করে আর তখন নিজেকে
দেখি শুয়ে আছি
শবাধারে। ফুলের সম্ভার নেই, কৃষ্ণ গ্রন্থ এক প'ড়ে আছে পাশাপাশি

মনে হয়, পুরোনো কাগজ, ভাঙা পাত্র,
বিলেতী দুধের শূন্য টিন
ইত্যাকার বাতিল বস্তুর মধ্যে ব'সে আছি একা
শহরতলীর হু হু ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরে
তখন কালচে আকাশের পক্ষী-মালাকে ধূসর
বিদায়ী রুমাল ব'লে মনে হয় শুধু।

রাজকাহিনী

ধন্য রাজ্য ধন্য,
দেশজোড়া তার সৈন্য!

পথে-ঘাটে ভেড়ার পাল!
চাষীর গরু, মাঝির হাল,
ঘটি-বাটি, গামছা, হাঁড়ি,
সাত-মহলা আছে বাড়ি,
আছে হাতি, আছে ঘোড়া।
কেবল পোড়া মুখে পোরার

দু'মুঠো নেই অন্ন,
ধন্য রাজ্য ধন্য!

ঢ্যাম কুড় কুড় বাজনা বাজে,
পথে-ঘাটে সান্ত্রী সাজে।
শোনো সবাই হুকুমনামা,
ধরতে হবে রাজার ধামা।
বাঁ দিকে ভাই চলতে মানা,
সাজতে হবে বোবা-কানা।
মস্ত রাজা হেলে দুলে
যখন-তখন চড়ান শূলে

মুখটি খোলার জন্য।
ধন্য রাজা ধন্য।

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়?

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়?
তেমন যোগ্য সমাধি কই?
মৃত্তিকা, বলো, পর্বত বলো
অথবা সুনীল সাগর-জল—
সব কিছু ছেঁদো, তুচ্ছ শুধুই।
তাইতো রাখি না এ লাশ আজ
মাটিতে পাহাড়ে কিম্বা সাগরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই॥

একপাল জেব্রা

এই ঘরের শব্দ আর নৈঃশব্দ্যকে সাক্ষী রেখে,
সাক্ষী রেখে আস্তাবলের গন্ধ, দক্ষিণের তাকে রাখা
শূন্য কফির কৌটো, বারান্দায় শুকোতে দেয়া হাওয়ায়
দু'লে ওঠা শাদা শার্ট, যে শার্টের কলার একবার
কোনো বেজায় সাংস্কৃতিক মহিলার লিপস্টিক ভূষণে
সজ্জিত হয়েছিলো, উজাড় মানি-ব্যাগ
আর দর্পণের সুহৃদকে সাক্ষী রেখে লিখি কবিতা।

নিপুণ গার্ডের মতো হুইসিল বাজাতে বাজাতে সবুজ ফ্ল্যাগ
ওড়াতে ওড়াতে একটি কবিতার শাঁ শাঁ ট্রেনকে
অন্তিম স্টেশনে পৌঁছে দিতে-না-দিতেই
কিছু পঙ্‌ক্তি পেয়ে বসে আমাকে আবার। দুর্দান্ত
এক পাল জেব্রার মতো ওরা আমার বুকে ধুলো উড়িয়ে বারংবার
ছুটে যায়, ফিরে আসে।

বন্দী শিবির থেকে

এক ধরনের অহংকার

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?

তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাইয়ের রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে ব'লে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে ব'লে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের উপর।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে এক থুথুরে বুড়ো
উদাস দাওয়ায় ব'সে আছেন — তাঁর চোখের নীচে অপরাহ্ণের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধ'রে দগ্ধ ঘরের।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
ব'সে আছে পথের ধারে।
তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী ব'লে যে নৌকো চালায় উদ্দাম ঝড়ে
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিকশাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো
সেই তেজী তরুণ যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হ'তে চলেছে—
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাঙলায়
তোমাকেই আসতে হবে, হে স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা তুমি

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।

ক্ষমা করুন রবীন্দ্রনাথ, আপনার মহান মায়াবী শৈলাবাস থেকে,
ভুল বুঝবেন না নজরুল, আপনার হার্মোনিয়ামের আওয়াজে
মধুর মজলিশ আর হাসির হুল্লোড় থেকে,
কিছু মনে করবেন না জীবনানন্দ, আপনার স্যুররিয়ালিস্ট হরিণেরা
যেখানে দৌড়ে যায়, সেখান থেকে,
মাফ করবেন বিষ্ণু দে, আপনার স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত থেকে
অনেক দূরে যেতে চায় সেই দামাল জেব্রাগুলো।
আমি একলা প্রান্তরের মতো প'ড়ে থাকি। জেব্রাগুলো তুমুল
উদ্দামতায় মেতে ওঠে, তাদের উত্তপ্ত নিশ্বাসে
আমাদের হৃদয়ের অন্তর্লীন তৃণরাজি শিখার উজ্জ্বলতা পায় কখনো,
ফিরে আসে না আর। আমি একলা প্রান্তরে ডাকতে ডাকতে
ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি, ওরা ফিরে আসে না তবু। প'ড়ে থাকি
অসহায়, ব্যর্থ। তখন দুক্ষোভে নিজেরই হাত
কামড়ে ধরতে ইচ্ছে হয়, আমার প্রিয়তম স্বপ্নগুলোর
চোখে কালো কাপড় বেঁধে গুলি চালাই ওদের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য ক'রে।

নিপুণ গার্ডের মতো হুইসিল বাজাতে বাজাতে, সবুজ ফ্ল্যাগ
ওড়াতে ওড়াতে একটি কবিতার শাঁ শাঁ ট্রেনকে
অন্তিম স্টেশনে পৌঁছে দিতে-না-দিতেই আবার এক পাল জেব্রা
তুমুল ছুটোছুটি করে বাতাস চিরে রৌদ্র ফুঁড়ে আমার বুকের আফ্রিকায়

দুঃস্বপ্নের একদিন

চাল পাচ্ছি, ডাল পাচ্ছি, তেল নুন লকড়ি পাচ্ছি,
ভাগ-করা পিঠে পাচ্ছি, মদির রাত্তিরে কাউকে নিয়ে
শোবার ঘর পাচ্ছি, মুখ দেখবার
ঝকঝকে আয়না পাচ্ছি, হেঁটে বেড়ানোর
তকতকে হাসপাতালী করিডর পাচ্ছি।
কিউতে দাঁড়িয়ে খাদ্য কিনছি,
বাদ্য শুনছি।

সরকারী বাসে চড়ছি,
দরকারী কাগজ পড়ছি,
কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি,
খাচ্ছি দাচ্ছি, চকচকে ব্লেডে দাড়ি কামাচ্ছি, দু'বেলা
পার্কে যাচ্ছি, মাইক্রোফোনী কথা শুনছি,
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।

আপনারা নতুন পয়ঃপ্রণালী পরিকল্পনা নিয়ে
জল্পনা কল্পনা করছেন,
কারাগার পরিচালনার পদ্ধতি শোধরাবার
কথা ভাবছেন (তখনো থাকবে কারাগারে)
নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে, মাটি কাটছে ট্রাক্টর,
ফ্যাক্টরি ছড়াচ্ছে ধোঁয়া, কাজ হচ্ছে,
কাজ হচ্ছে,
কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি।

মধ্যে মধ্যে আমার মগজের বাগানের সেই পাখি
গান গেয়ে ওঠে, আমার চোখের সামনে
হঠাৎ কোনো রুপালি শহরের উদ্ভাসন।
দোহাই আপনাদের, সেই পাখির
টুঁটি চেপে ধরবেন না, হত্যা করবেন না বেচারীকে।

কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি,
খাচ্ছি দাচ্ছি, চকচকে ব্লেডে দাড়ি কামাচ্ছি, দু'বেলা
পার্কে যাচ্ছি, মাইক্রোফোনী কথা শুনছি,
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।

করত তোমাকে ওরা, দিত ডুব গহন পাতালে।
তুমি আর ভবিষ্যৎ যাচ্ছো হাত ধ'রে পরস্পর।
সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি, দুঃখ-তাড়ানিয়া ;
তুমি তো আমার ভাই, হে নতুন, সন্তান আমার।

সান্ধ্য আইন

এ শহরে কি আজ কেউ নেই ? কেউ নেই ?
এইতো প্রতিটি নীরব বারান্দায়
বিষাদ দাঁড়ানো কবির মতন একা।

এ শহরে কি আজ কেউ নেই ? কেউ নেই ?
আমার সমান-বয়সী দুঃখ দেখি
বসে আছে চুপ নিথর আঁধার ঘরে।

এ শহর আজ মৃতের নগরী নাকি ?
মৃতেরা এবং গোরখোদকের দল
একটি ভীষণ নকশায় নিষ্প্রাণ।

এ শহরে কি আজ কেউ নেই ? কেউ নেই ?
আশেপাশে আছে গাছ-গাছালির শোভা।
পাতার আড়ালে জ্বলছে সে কার চোখ ?

স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল
স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শাণিত-কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখীর দিগন্ত জোড়া মত্ত ঝাপটা।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।
স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালোচুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা

খুকীর অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা

কাক

গ্রাম্য পথে পদচিহ্ন নেই। গোঠে গরু
নেই কোনো, রাখাল উধাও, রুক্ষ সরু
আল খাঁ খাঁ, পথপার্শ্বে বৃক্ষেরা নির্বাক
নগ্ন রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক

এখানে দরজা ছিল

এখানে দরজা ছিলো, দরজার ওপর মাধবী-
লতার একান্ত শোভা। বারান্দায় টব, সাইকেল
ছিলো, তিন চাকা-অলা, সবুজ কথক একজন
দাঁড়বন্দী। রান্নাঘর থেকে উঠতো রেশমী ধোঁয়া।

মখমল পায়ে কেউ, এঁটোকাঁটাজীবী, অন্ধকারে
রাখতো কখনো জেলে এক জোড়া চোখ। ভোরবেলা
খবর কাগজে মগ্ন কে নীরব বিশ্ব-পর্যটক
অকস্মাৎ তাকাতেন কাকময় দেয়ালের দিকে।

ভাবতেন শৈশবের মাঠ, বল-হারানোর খেদ
বাজতো নতুন হয়ে। মুহূর্তে মুহূর্তে শুধু বল
হারাতেই থাকে, কোনো হুইসিল পারে না রুখতে।
ক্ষতির খাতায় হিজিবিজি অঙ্কগুলি নৃত্যপর।

এক ধরনের অহংকার

এখনো দাঁড়িয়ে আছি, এ আমার এক ধরনের অহংকার।

বেজায় টলছে মাথা, পায়ের তলায় মাটি সারা দিনমান
পলায়নপর,
হা-হা গোরস্তান ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না
আপাতত, তবু ঠিক রয়েছি দাঁড়িয়ে
প্রখর হাওয়ায় মুখ রেখে।
অত্যন্ত জরুরী কোনো আবহাওয়া ঘোষণার মতো
দশদিক রটাচ্ছে কেবলি : হাড়ে ঘাস
গজাতে গজাতে
বুকে হিম নিয়ে তুমি নির্বান্ধব, বড়ো একা হয়ে যাচ্ছো।
আমার ভূভাগ থেকে আমাকে উৎখাত করবার জন্যে কতো
পাইক পেয়াদা
আসছে চৌদিক থেকে, ওরা তড়িঘড়ি
আমার স্বপ্নের
বেবাক স্থাবর অস্থাবর
সম্পত্তি করবে ক্রোক, কেউ কেউ ডাকছে নীলাম
তারস্বরে, কিন্তু আমি উপদ্রুত কৃষকের মতো
এখনো দাঁড়িয়ে আছি চালে,
ছাড়ছিনে জলমগ্ন ভিটে।

আমার বিরুদ্ধে দুঃখ সারাক্ষণ লাগায় পোস্টার
দেয়ালে দেয়ালে,
আমার বিরুদ্ধে আশা ইস্তাহার বিলি করে অলিতে গলিতে,
আমার বিরুদ্ধে শান্তি করে সত্যাগ্রহ,
আমার ভেতব ক্ষয় দিয়েছে উড়িয়ে হাড় আর
করোটি-চিহ্নিত তার অসিত পতাকা।
আমার জনক এত ব্যর্থতার শব আজীবন বয়েছেন
কাঁধে, বঞ্চনার মায়াবী হরিণ তাঁকে এত বেশি

ঘুরিয়েছে পথে ও বিপথে, আত্মহত্যা করবার
কথা ছিল তাঁর, কিন্তু তিনি যেন সেই অশ্বারোহী
জিনচ্যুত হয়েও যে ঘোড়ার কেশর ধ'রে ঝুলে থাকে জেদী,
দাঁতে দাঁত ঘ'ষে।

আমার জননী এত বেশি দুঃখ সয়েছেন, এত বেশি
ছেঁড়াখোঁড়া স্বপ্নের প্রাচীন কাঁথা করেছেন সেলাই নিভৃতে,
দেখেছেন এত বেশি লাল ঘোড়া পাড়ায় পাড়ায়,
এতবার স্বপ্নে, জাগরণে
ভূমিকম্পে উঠেছেন কেঁপে, তার ভয়ানক কোনো মাথার অসুখ
হওয়া ছিলো স্বাভাবিক ; কিন্তু ঘোর উন্মত্ততা তাঁর
পাশাপাশি থেকেও কখনো তাঁকে স্বাভাবিকতার
ভাস্বর রেহেল থেকে পারেনি সরাতে একচুলও।
বুঝি তাই দুঃসময়ে আমার আপন শিরা উপশিরা জেদী
অশ্বক্ষুরে প্রতিধ্বনিময়। যেদিকেই বাড়াই না পদযুগ,
কোনোদিন কোনো
গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবো না। আমি সেই অভিযান-
প্রিয় লোক, যার পদচ্ছাপ মরুভূমি ধ'রে রাখে
ক্ষণকাল যার আর্ত উদাস কংকাল থাকে প'ড়ে
বালির ওপর অসহায়, অথচ কাছেই হৃদ্য মরূদ্যান।
কী-যে হয়, একবার রক্তস্রোতে অন্যবার পূর্ণাঙ্গ জ্যোৎস্নায়
ভেসে যায় হৃদয় আমার। যেদিকে বাড়াই হাত
সেদিকেই নামে ধস, প্রসারিত হাতগুলো তলহীন গহ্বরে হারায়
আর আমি নিজে যেন পৌরাণিক জন্তুর বিশাল
পিঠের ওপর একা রয়েছি দাঁড়িয়ে ; চতুষ্পার্শ্বে
অবিরল যাচ্ছে বয়ে লাভাস্রোত, কম্পমান ভূমি,
প্রলয়ে হইনি পলাতক,
নিজস্ব ভূভাগে একরোখা
এখনো দাঁড়িয়ে আছি, এ আমার এক ধরনের অহংকার।

এখানে দরজা ছিলো, দরজার ওপর মাধবী-
লতার একান্ত শোভা। এখন এখানে কিছু নেই,
কিচ্ছু নেই। শুধু এক বেকুব দেয়াল, শেল-খাওয়া,
কেমন দাঁড়ানো, একা। কতিপয় কলঙ্কিত ইঁট
আছে প'ড়ে ইতস্তত। বাঁ দিকে তাকালে ভাঙাচোরা
একটি পুতুল পাবে, তা ছাড়া এখানে কিছু নেই।

ভগ্নস্তূপে স্থির আমি, ধ্বংসচিহ্ন নিজেই যেন বা;
ভস্ম নাড়ি জুতো দিয়ে, যদি ছাই থেকে অকস্মাৎ
জেগে ওঠে অবিনাশী কোনো পাখি, যদি দেখা যায়
কারুর হাসির ছটা, উন্মীলিত স্নেহ, ভালোবাসা।

তুমি বলেছিলে

দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার।
পুড়ছে দোকানপাট, কাঠ,
লোহালক্কড়ের স্তূপ, মসজিদ এবং মন্দির।
দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার।
বিষম পুড়ছে চতুর্দিকে ঘরবাড়ি।
পুড়ছে টিয়ের খাঁচা, রবীন্দ্র রচনাবলী, মিষ্টান্ন ভাণ্ডার,
মানচিত্র, পুরোনো দলিল।
মৌচাকে আগুন দিলে যেমন সশব্দে
সাধের আশ্রয়ত্যাগী হয়
মৌমাছির ঝাঁক
তেমনি সবাই
পালাচ্ছে শহর ছেড়ে দিগ্বিদিক। নবজাতককে
বুকে নিয়ে উদ্ভ্রান্ত জননী
বনপোড়া হরিণীর মতো যাচ্ছে ছুটে।

অদূরে গুলির শব্দ, রাস্তা চষে জঙ্গী জীপ। আর্ত
শব্দ সবখানে। আমাদের দু'জনের
মুখে আগুনের খরতাপ। আলিঙ্গনে থরোথরো
তুমি বলেছিলে,
'আমাকে বাঁচাও এই বর্বর আগুন থেকে, আমাকে বাঁচাও'
আমাকে লুকিয়ে ফেলো চোখের পাতায়
বুকের অতলে কিংবা একান্ত পাঁজরে,
শুষে নাও নিমেষে আমাকে
চুম্বনে চুম্বনে।

দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার
আমাদের চৌদিকে আগুন,
গুলির ইস্পাতী শিলাবৃষ্টি অবিরাম।
তুমি বলেছিলে,
'আমাকে বাঁচাও।'
অসহায় আমি তা-ও বলতে পারিনি।

গেরিলা

দেখতে কেমন তুমি? কী রকম পোশাক-আশাক
প'রে করো চলাফেরা? মাথায় আছে কি জটাজাল?
পেছনে দেখতে পাবো জ্যোতিশ্চক্র সন্তের মতন?
টুপিতে পালক গুঁজে অথবা জবরজঙ ঢোলা
পাজামা কামিজ গায়ে মগডালে একা শিস দাও
পাখির মতন কিংবা চা-খানায় বসো ছায়াচ্ছন্ন।

দেখতে কেমন তুমি?— অনেকেই প্রশ্ন করে, খোঁজে
কুলুজি তোমার আঁতিপাঁতি। তোমার সন্ধানে ঘোরে
ঝানু গুপ্তচর, সৈন্য, পাড়ায় পাড়ায়। তন্ন তন্ন
ক'রে খোঁজে প্রতি ঘর। পারলে নীলিমা চিরে বের

দুঃসময়ের মুখোমুখি

স্যামসন

ক্ষমতামাতাল জঙ্গী হে প্রভুরা ভেবেছো তোমরা,
তোমাদের হোমরা চোমরা
সভাসদ, চাটুকার সবাই অক্ষত থেকে যাবে চিরদিন ?
মৃত এক গাধার চোয়ালে, মনে নেই ফিলিস্তিন,
দিয়েছি গুঁড়িয়ে কতো বর্বরের খুলি ? কতো শক্তি
সঞ্চিত আমার দুটি বাহুতে, সেও তো আছে জানা। রক্তারক্তি
যতই কর না আজ, ত্রাসের বিস্তার
করুক যতই পাত্রমিত্র তোমাদের, শেষে পাবে না নিস্তার।

আমাকে করেছো বন্দী, নিয়েছো উপড়ে চক্ষুদ্বয়।
এখন তো মেঘের অঢেল স্বাস্থ্য, রাঙা সূর্যোদয়
শিশুর অস্থির হামাগুড়ি, রক্তোৎপল যৌবন নারীর আর
হাওয়ায় স্পন্দিত ফুল পারি না দেখতে। বার বার
কী বিশাল দৃষ্টিহীনতায় দৃষ্টি খুঁজে মরি। সকাল সন্ধ্যার
ভেদ লুপ্ত ; মসীলিপ্ত ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে চকিতে মন্দার
জেগে উঠলেও অলৌকিক শোভা তার থেকে যাবে নিস্তরঙ্গ
অন্তরালে। এমন-কি ইঁদুরও বান্ধব অন্তরঙ্গ
সাম্প্রতিক, এমন নিঃসঙ্গ আমি। নিজ দোষে আজ
চক্ষুহীন, হৃতশক্তি, দুঃস্বপ্নপীড়িত। এখন আমার কাজ
ঘানি ঠেলা, শুধু ভার বওয়া শৃঙ্খলের। পদে পদে
কেবলি হোঁচট খাই দিনরাত্রি, তোমার অটল মসনদে।
শত্রু-পরিবৃত হ'য়ে আছি ; তোমাদের চাটুকার
উচ্ছিষ্ট-কুড়ানো সব আপনি-মোড়ল, দুঃস্থ ভাঁড়
সর্বদাই উপহাস করছে আমাকে। দেশবাসী
আমাকে বাসে তো ভালো আজো— যাদের অশেষ দুঃখে কাঁদি হাসি
আনন্দে। পিছনে ফেলে এসেছি কতো যে রাঙা সুখের কোরক
যেমন বালক তার মিষ্টান্নের সুদৃশ্য মোড়ক।

আমাকে করেছো অন্ধ, যেন আর নানান দুষ্কৃতি
তোমাদের কিছুতেই না পড়ে আমার চোখে। স্মৃতি
তাও কি পারবে মুছে দিতে? যা দেখেছি এতদিন—
পাইকারী হত্যা দিগ্বিদিক রমণীদলন আর ক্লান্তিহীন
রক্তাক্ত দস্যুতা তোমাদের, বিধ্বস্ত শহর, অগণিত
দগ্ধ গ্রাম, অসহায় মানুষ তাড়িত ক্লান্ত, ভীত
—এই কি যথেষ্ট নয়? পারবে কি এ-সব ভীষণ
দৃশ্যাবলী আমূল উপড়ে নিতে আমার দু-চোখের মতন?

দৃষ্টি নেই, কিন্তু আজো রক্তের সুতীব্র ঘ্রাণ পাই
কানে আসে আর্তনাদ ঘন ঘন, যতই সাফাই
তোমরা গাও না কেন, সব-কিছু বুঝি ঠিকই। ভেবেছো এখন
দারুণ অক্ষম আমি, উদ্যানের ঘাসের মতন
বিষম কদম-ছাঁটা চুল। হীনবল, শৃঙ্খলিত
আমি, তাই সর্বক্ষণ করছো দলিত।

আমার দুরন্ত কেশরাজি পুনরায় যাবে বেড়ে,
ঘাড়ের প্রান্তর বেয়ে নামবে দুর্দমনীয়, তেড়ে-
আসা নেকড়ের মতো। তখন সুরম্য প্রাসাদের
সব স্তম্ভ ফেলবো উপড়ে, দেখো, কদলী বৃক্ষের অনুরূপ। দম্ভ
চূর্ণ হবে তোমাদের, সুনিশ্চিত করবো লোপাট
সৈন্য আর দাস-দাসী-অধ্যুষিত এই রাজ্যপাট।

সফেদ পাঞ্জাবি

শিল্পী কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক
খদ্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবিকা,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, অধ্যাপক, গোয়েন্দা, কেরানি,
সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন

দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী
কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি, দৃঢ়, ঋজু,
যেন মহাপ্লাবনের পর নূহের গভীর মুখ
সহযাত্রীদের মাঝে ভেসে ওঠে, কাশফুল-দাড়ি
উত্তুরে হাওয়ায় ওড়ে। বুক তাঁর বিচূর্ণিত দক্ষিণ বাংলার
শবাকীর্ণ হু-হু উপকূল, চক্ষুদ্বয় সংহারের
দৃশ্যবলিময়. শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা
নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার। জনসমাবেশে
সখেদে দিলেন ছুঁড়ে সারা খাঁ-খাঁ দক্ষিণ বাংলাকে।
সবাই দেখলো চেনা পল্টন নিমেষে অতিশয়
কর্দমাক্ত হয়ে যায়, ঝুলছে সবার কাঁধে লাশ।
আমরা সবাই লাশ, বুঝি-বা অত্যন্ত রাগী কোনো
ভৌতিক কৃষক নিজে সাধের আপনকার ক্ষেত
চকিতে করেছে ধ্বংস, পড়ে আছে নষ্ট শস্যকণা।

ঝাঁকা-মুটে, ভিখিরী, শ্রমিক, ছাত্র, সমাজসেবিকা,
শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, ফিরিঅলা, গোয়েন্দা, কেরানি,
সমস্ত দোকান-পাট, প্রেক্ষাগৃহ, ট্রাফিক পুলিস,
ধাবমান রিক্‌শা, ট্যাক্‌সি, অতিকায় ডবল ডেকার,
কোমল ভ্যানিটি ব্যাগ আর ঐতিহাসিক কামান,
প্যাণ্ডেল টেলিভিশন, ল্যাম্পপোস্ট, রেস্তোরাঁ, দপ্তর
যাচ্ছে ভেসে, যাচ্ছে ভেসে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরে।
হায়, আজ একি মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী।

বল্লমের মতো ঝল্‌সে ওঠে তাঁর হাত বারবার
অতি দ্রুত স্ফীত হয়, স্ফীত হয়, মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবি
যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবি দিয়ে সব
বিক্ষিপ্ত বেআব্রু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান।

দুঃসময়ে মুখোমুখি

বাচ্চু তুমি, বাচ্চু তুই, চলে যাও, চলে যা সেখানে
ছেচল্লিশ মাহুৎটুলীর খোলা ছাদে। আমি ব্যস্ত, বড়ো ব্যস্ত,
এখন তোমার সঙ্গে, তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করার মতন
একটুও সময় নেই। কেন তুই মিছেমিছে এখানে দাঁড়িয়ে
কষ্ট পাবি বল ?

না, তোকে বসতে বলবো না,
কস্মিনকালেও,
তুই যা, চ'লে যা।
দেখছিস না, আমার হাতে কতো কাজ, দু-ঘণ্টায় পাঠক-ঠকানো
নিপুণ সম্পাদকীয় লিখতেই হবে, তদুপরি
আছে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় দেশ-বিদেশের বহু চিঠির জবাব
এবং প্রুফের তাড়া, নিত্য-নৈমিত্তিক
কবিতার সোনালি তাগিদ।
স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য কিছু ঘণ্টা
বাঁচিয়ে রাখতে হয়, আমার সময় প্রতিদিন
সুমিষ্ট পিঠের মতো
ভাগ ক'রে নিয়মিত খাচ্ছে হে সবাই।
তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করার মতন, বাচ্চু তুই
বল তো সময় কই ? কতক্ষণ থাকবি দাঁড়িয়ে,
রাখবি ঝুলিয়ে ঠোঁটে দুষ্টু হাসি ?
তুই তো নাছোড় ভারী গোঁয়ার্তুমি ছেড়ে
এক্ষুনি চ'লে যা
শরৎ চক্কোত্তি রোডে; ছেচল্লিশ মাহুৎটুলীর খোলা ছাদে।
চকোলেট দেবো তোকে, দেবো তালশাঁস,
তুই যা চ'লে যা।
অবুঝ তুই না গেলে আমার সকল কাজ রইবে প'ড়ে।
পাশের বাড়ির তেজপাতা-রঙ বুড়িটার ঘরে
মাঘের সকালে

মায়ের কল্যাণী হাতে-বোনা হলদে সোয়েটার প'রে
যেতাম কিনতে পিঠা মোরগের ডাক-সচকিত
চাঁপা ভোরে, তোর মনে নেই
মেহেরের সঙ্গে, নতুন মামীর সঙ্গে নানীর সাধের
আচারের বৈয়াম করেছি লুট দুপুর বেলায়,

তোর মনে নেই ?

চকবাজারের ঘিঞ্জি গলির কিনারে
ম্যাজিকঅলার খেলা দেখেছি মোহন সন্ধ্যেবেলা

তোর মনে নেই ?

মিছিলে নাদিরা ছিলো আমি তাকে দেখে চটপট
মিছিলের আলো নিতে হলাম আগ্রহী, চৌরাস্তায়
সুদিনের জন্তে ব্যগ্র দিলাম শ্লোগান অবিরাম,—

তোর মনে নেই ?

আমিও সাঁকোর গোধূলি বেলায়, সঙ্গী পিতা।
চকিতে অদৃশ্য সাঁকো, জায়গাটা ভীষণ ফাঁকা, খাঁ-খাঁ
মনে হলো, যেমন অত্যন্ত শূন্য লাগে ক্যানভাস,
চিত্রকার ফেললে মুছে ভুল ছবি তার।
চিকন দিগন্তে হাম্বা রব, বলুন তো পাড়াতলী কতদূর ?
সঙ্গে তিনি, হেঁটে যেতে যেতে দিতেন ফুলের নাম ব'লে
বলতেন ঐ যে ছোট্ট খরগোশ, অনেক দূরের বিল থেকে
সদ্য-আনা শিকারের বোঝাটা নামিয়ে

রঙবেরঙের পাখিগুলো

শনাক্ত করতে ভিন্ন ভিন্ন নামে কী যে মজা পেতেন শিকারী।
দীর্ঘকাল সত্যি আমি মসজিদে যাইনি, শৈশবে
বাজান যেতেন হাত ধ'রে মনে পড়ে। ইমামের সুরা
অবোধ্য ঠেকতো ব'লে ঝাড়লণ্ঠনের
শোভা কিংবা দেয়ালে শোভন লতাপাতা, ঠাণ্ডা টালি
দেখে, হৌজে রঙিন মাছের খেলা দেখে

কাটতো সময় মসজিদে, তোর মনে নেই ?
কখনো ঝড়ের রাতে উথাল পাথাল রাতে, ব্যাকুল বাজান
দিতেন আজান, যেন উদাত্ত সে স্বর রুখবেই
অমন দামাল ঝড়, বাঁচাবে থুথ্‌ড়ে ঘরবাড়ি—তোর মনে নেই ?
কী বললি ? এসেছিস দেখতে আমাকে ?
এখন কেমন আছি ? কতো সুখে আছি ? না কি তুই
চতুর ছুতোয়
আমার ইণ্টারভিউ নিতে চাস এতদিন পর।
চিঠির খামের গায়ে আমার নামের আগে 'জনাব' দেখে কি
তোর খুব পাচ্ছে হাসি ? শোন,
আমি শামসুর রাহমান, মানে ভদ্রলোক, দিব্যি
ফিটফাট, ক্লীন গাল ব্লেডের কৃপায়
আর ধোপদুরস্ত পোশাকে
এখানে-সেখানে করি চলাফেরা বড়ো ঝলমলে
সামাজিকতায় ভরপুর,
কখনো উদাস ঘুরি চোরা কুঠুরিতে।
আমি শামসুর রাহমান মানে সাংবাদিক, ক্ষিপ্র ভাষ্যকার ;
আমি শামসুর রাহমান, মানে কবি···
আইডিয়াভিযানে আমিও
কখনো সমুদ্রে ভাসি, পর্বতশিখরে আরোহণ
করি কখনো-বা, পার হই রুক্ষ মরুভূমি, মেরুপথে পুঁতি
আপন নিশান।
একটি অদ্ভুত ঘোড়া আমাকে পায়ের নিচে দ'লে
চ'লে যায় দূরে তার কেশর দুলিয়ে
কখনো শিকার করি, হরিণ শিকার করি ঘরে।

আমার অ্যানিমা স্বপ্নে সুদর্শনা হ'য়ে
আমাকে অনেক কাছে ডাকে মস্ত নদীর ওপারে। আমি তার
সান্নিধ্যের লোভে
আপ্রাণ সাঁতার কাটি। তীরে প্রেতভূমি, সুদর্শনা

অকস্মাৎ পেঁচা হ'য়ে উড়ে যায়। নদী পেরুনোর
শক্তি লুপ্ত, কেমন তলিয়ে যাই পরিণামহীন।
চিনতিস তুই যাকে, সে আমার মধ্য থেকে উঠে অন্তরালে
চ'লে গেছে। তুই বাচ্চু, তুই বড়ো ছেলেমানুষ, অবুঝ।
কী বললি? শামসুর রাহমান নামক ধূসর
ভদ্রলোকটির
সমান বয়সী তুই? তবে কোন ইন্দ্রজালে আজো
অমন সবুজ র'য়ে গেলি, এগারোয় হাঁ রে?
এই যে আমাকে ছাখ, ভালো করে ছাখ, ছাখ
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে—
আমার জুলফি শাদা দীর্ঘশ্বাসে ভরা, দন্তশূলে
প্রায়শ কাতর হই, চশমার পাওয়ার
দ্রুত যাচ্ছে বেড়ে···
এখন এই তো আমি, ব্যস্ত অবসন্ন, বিশ্রামের
নেই মহলত।
উজাড় মাইফেলের প্রেত ঘুরি হা-হা বারান্দায়।
এখন আমিও খুব সহজে ঠকাতে পারি, বন্ধুর নিন্দায়
জোর মেতে উঠতে লাগে না দু-মিনিটও; কখনো-বা
আত্মীয়ের মৃত্যুকামনায় কাটে বেলা, পরস্ত্রীর
স্তনে মুখ রাখার সময় বেমালুম ভুলে থাকি
গৃহিণীকে। আমাকে ভীষণ ঘেন্না করছিস, না রে?
এখন এই তো আমি। চিনতিস তুই যাকে সে আমার
মধ্য থেকে উঠে
বিষম সুদূর ধু-ধু অন্তরালে চ'লে গেছে। তুইও যা, চ'লে যা

ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা

ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা

ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, এবার আমি
গোলাপ নেবো।
গুলবাগিচা বিরান ব'লে হরহামেশা
ফিরে যাবো,
তা' হবে না দিচ্ছি ব'লে।
ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, এবার আমি
গোলাপ নেবো।

ফিরতে হ'লে বেলাবেলি হাঁটতে হবে
অনেকখানি।
বুক-পাঁজরের ঘেরাটোপে ফুচ্‌কি মারে
আজব পাখি।
পক্ষী তুমি সবুর করো,
শ্যাম-প্রহরে ডোবার আগে, একটু শুধু
মেওয়া খাবো।

শিরায় শিরায় এখনো তো রক্ত করে
অসভ্যতা।
বাচাল কণা খিস্তি করে হাফ গেরস্ত
প্রেমের টানে;
হঠাৎ দেখি চক্ষু টেপে
গন্ধবণিক কালাচাঁদের মিষ্টি মিষ্টি
হ্রস্ব পত্নী।

বিষ ছড়ালো কালনাগিনী বুকের ভেতর
কোন্ সকালে।
হচ্ছি কালো ক্রমাগত, অলক্ষুণে
বেলা বাড়ে।

সর্পিণী তুই কেমনতরো ?
বিষ-ঝাড়ানো রোজা ডেকে রক্ষা পাওয়া
কঠিন হলো।

ছিলাম প'ড়ে কাঁটাতারে বিদ্ধ হ'য়ে
দিনদুপুরে,
রাতদুপুরে, মানে আমি সব দুপুরে
ছিলাম প'ড়ে।
বাঁচতে গিয়ে চেটেছিলাম
রুক্ষ ধুলো ; জল নিজের কষ-গড়ানো
রক্তধারায়।

ইতিমধ্যে এই মগজে, ক'খানা হাড়
জমা হলো ?
ইতিমধ্যে এই হৃদয়ে, ক'খানা ঘর
ধ্বংস হলো ?
শক্ত পাকা হিসাব পাওয়া।
টোক-ফর্দের পাতাগুলো কোন্ পাতালে
নিমজ্জিত ?

তালসুপুরি গাছের নিচে, সন্ধ্যা নদীর
উদাস তীরে,
শান-বাঁধানো পথে পথে, বাস ডিপোতে,
টার্মিনালে,
কেমন একটা গন্ধ ঘোরে।
আর পারি না, দাও ছড়িয়ে পদ্মকেশর
বাংলাদেশে।

ঘাতক তুমি সরে দাঁড়াও, এবার আমি
লাশ নেবো না।

নই তো আমি মুদ্দোফরাস।   জীবন থেকে
সোনার মেডেল,
শিউলিফোটা সকাল নেবো।
ঘাতক তুমি বাদ সেধো না, এবার আমি
গোলাপ নেবো।

মাৎস্যন্যায়

জলজ দুপুরে কিংবা টইটুম্বুর রাত্তিরে নদী
যখন সঙ্গীতময় হয়, সে আপন অন্তরালে
ভাসমান খুশি যেন।   তবু ভয়, কাঁটাতার-ভয়
তার এই মাঝারি সত্তায় লেগে থাকে সারাক্ষণ
কেমন রহস্যময় বিষাক্ত গুল্মের মতো।   বড়ো
মাছ তাকে দেখলেই ধেয়ে আসে, লোভাতুর; আর
সে পালায় ঊর্ধ্বশ্বাসে, যেন বা দেহের কাঁটাজাল
আসবে বেরিয়ে ত্বক ফুঁড়ে, খোঁজে সগোত্রের ব্যূহ
এখানে সেখানে শত্রু-তাড়িত, সন্ত্রস্ত, দিক ভুলে
হায়, এসে যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুধার্ত মাছের সংঘে
আক্রমণে মত্ত ওরা।   সে অত্যন্ত একা, মীনরাজ্যে
অভিমন্যু, আর্ত, ক্লান্ত সাঁতার-রহিত, নিরুপায়

আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি

শান্তি পাই

যখন তুমি অনেক দূর থেকে
এখানে এই গলির মোড়ে আসো,
উঠোনে দাও পায়ের ছাপ এঁকে,
শান্তি পাই।

যখন তুমি দেহের বাঁকে বাঁকে
স্মৃতির ভেলা ভাসাও, তোলো পাল,
মুক্ত করো যমজ পায়রাকে
শান্তি পাই।

যখন তুমি আমার পিপাসায়
নিমেষে হও আঁজলাভরা জল,
দৃষ্টিজাল ছড়াও কী আশায়,
শান্তি পাই।

যখন তুমি ঠোঁটের বন্দরে
বিছিয়ে দাও গালিচা রক্তিম,
প্রভাত জ্বালো চোখের কন্দরে,
শান্তি পাই।

ঝঞ্ঝাহত উজাড় এ বাগানে
আন্দোলিত তুমিই শেষ ফুল।
জাগাও তুমি সবুজ পাতা প্রাণে,
শান্তি পাই।

যখন তুমি দুপুরে ঘুমে ভাসো,
তোমার বুকে অতিথি প্রজাপতি;
থমকে থাকে ভয়ে সর্বনাশও,
শান্তি পাই।

যখন তুমি জলের গান হয়ে
আমার দেহে আমার মজ্জায়
কী উজ্জ্বল জোয়ারে যাও ব'য়ে,
শান্তি পাই।

যখন তুমি আমার ঠোঁটে রাখো
একটি লাল গোলাপ, আত্মায়
ঝরাও পাতা, আবেগভরে ডাকো,
শান্তি পাই।

যখন তুমি হাওয়ায় দাও মেলে
তিমির-ছেঁড়া আমার এ পতাকা,
কিংবা আসো বিরূপ জল ঠেলে,
শান্তি পাই।

নো এক্সিট

আমাকে যেতেই হবে যদি, তবে আমি
যীশুর মতন নগ্ন পদে চলে যেতে চাই। কাঁধে
ক্রুশকাঠ থাকতেই হবে কিংবা কাঁটার মুকুট
মাথায় পরতে হবে, এটা কোনো কাজের কথা না।
এসব মহান
অলংকার আমার দরকার নেই। বাস্তবিক আমি
এক হাত নীল ট্রাউজারের পকেটে রেখে অন্য হাত নেড়ে নেড়ে
সিঁড়ি বেয়ে 'আচ্ছা চলি, তাহলে বিদায়' ব'লে একটি উচ্ছিষ্ট
রাত্রি ফেলে রেখে
নির্জন পেছনে
অত্যন্ত নিভৃত নিচে, শিরদাঁড়াময়
নক্ষত্রটোলার পত্রপত্রালির ঈষৎ দুলুনি নিয়ে
খুব নিচে চলে যেতে চাই।

অবশ্য সহজ নয় এভাবে চকিতে চলে যাওয়া। অ্যাশট্রেতে
টুকরো টুকরো মৃত সিগারেট, শূন্য গ্লাশগুলো
বৈধব্যে নিস্তব্ধ আর টেবিলে বেজায় উল্টোপাল্টা পাণ্ডুলিপি
—প্রস্থানের আগে
এই সব খুঁটিনাটি বেকুব অত্যন্ত আর্তস্বরে পিছু ডাক দেয়।

তখন আমার বুকে তিন লক্ষ টিয়ে
তুমুল ঝাঁপিয়ে পড়ে, কয়েক হাজার নাঙা বিকট সন্ন্যাসী
চিমটে বাজাতে থাকে চতুর্ধারে. পাঁচশো কামিনী
দুলুনিপ্রবণ স্তন বের ক'রে ধেই ধেই নাচ শুরু করে।
আর আমি চোখ-কান বন্ধ ক'রে সাত তাড়াতাড়ি
বিদায় বিদায় ব'লে ক্ষিপ্র দৌড়বাজের মতন
ছুটে যাই, ছুটে যাই দূরে অবিরত। ইচ্ছে হলেও প্রবল
কাউকে দিই না অভিশাপ ; এতদিনে জেনে গেছি
আমার কর্কশ অভিশাপে
কোনো নারী গাছ কিংবা প্রতিধ্বনি হবে না কখনো,
অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় ফেলবে না হারিয়ে নৌকোয় কোনো শকুন্তলা,
এমন কি খসবে না একটিও পালক বিবাগী মরালের।
সার্কাস ফুরিয়ে গেলে অ্যাক্রোব্যাট অথবা ক্লাউন
সবাই বিষণ্ণ হয় আগোচরে হয়তো বা। কেউ ছেঁড়ে চুল,
অন্ধকার তাঁবুর ভেতর কেউ খায় হাবুডুবু
দুঃস্বপ্নের ক্ষুধার্ত কাদায়,
কেউ বা একটি লাল বলের পেছনে
ছুটতে ছুটতে কৈশোরের সমকামী প্রহরে প্রবেশ করে,
বমিতে ভাসায় মাটি কেউ, কেউ উত্তপ্ত প্রলাপে।

হে আমার বন্ধুগণ দোহাই আপনাদের, দেরি সইছে না ;
দিন বলে দিন,
তা'হলে আমি কি এই সার্কাসের কেউ? আপনারা
যে যাই বলুন, এই গা ছুঁয়ে বলছি, মাঝে-মধ্যে,
না, ঠিক হলো না, প্রায়শই বলা চলে,

নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়। স্বজনের লাশ
কবরে নামিয়ে চটপট
ঢোক ঢোক গিলতে পারি মদ খুব ধোঁয়াটে আড্ডায়,
প্রিয়তম বন্ধু
আত্মহত্যা করেছে শুনেও নিদারুণ
মানসিক নিপট খরায়
অবৈধ সংগম ক'রে ঘামে নেয়ে উঠতে পারি সহজ অভ্যাসে।

আমাকে যেতেই হবে যদি, তবে আমি
যীশুর মতন নগ্ন পদে চলে যেতে চাই। অথচ হঠাৎ
একজন তারস্বরে বলে ওঠে, 'নো এক্সিট, শোনো
তোমার গন্তব্য নেই কোনো।' না থাকুক, তবু যাবো,
দিব্যি হাত নেড়ে নেড়ে চলে যাবো, কেউ
বাধা দিতে এলে
বিষম শাসিয়ে দেবো, লেট মি এলোন, স'রে দাঁড়াও সবাই···
লক্ষ্মী কি অলক্ষ্মী আমি চাই না কিছুই, চাই শুধু যেতে চাই।

একটি কবিতার জন্যে

বৃক্ষের নিকটে গিয়ে বলি:
দয়াবান বৃক্ষ তুমি একটি কবিতা দিতে পারো?
বৃক্ষ বলে, আমার বাকল ফুঁড়ে আমার মজ্জায়
যদি মিশে যেতে পারো, তবে
হয়তো বা পেয়ে যাবে একটি কবিতা।

জীর্ণ দেয়ালের কানে বলি:
দেয়াল আমাকে তুমি একটি কবিতা দিতে পারো?
পুরোনো দেয়াল বলে শেওলা-ঢাকা স্বরে,
এই ইট সুরকির ভেতর যদি নিজেকে গুঁড়িয়ে দাও, তবে
হয়তো বা পেয়ে যাবে একটি কবিতা।

একজন বৃদ্ধের নিকটে গিয়ে বলি, নতজানু,
হে প্রাচীন দয়া ক'রে দেবেন কি একটি কবিতা ?
স্তব্ধতার পর্দা ছিঁড়ে বেজে ওঠে প্রাজ্ঞ কণ্ঠে — যদি
আমার মুখের রেখাবলী
তুলে নিতে পারো
নিজের মুখাবয়বে, তবে
হয়তো বা পেয়ে যাবে একটি কবিতা।

কেবল কয়েক ছত্র কবিতার জন্যে
এই বৃক্ষ, জরাজীর্ণ দেয়াল এবং
বৃদ্ধের সম্মুখে নতজানু আমি থাকবো কতোকাল ?
বলো, কতোকাল ?

বুদ্ধদেব বসুর প্রতি

বারবার স্বেচ্ছাচারী জ্যোৎস্না কেটে গিয়েছেন হেঁটে
সম্পূর্ণ একাকী, সঙ্গী মুক্তবোধ। চোখে নাগরিক
দৃশ্যাবলি গেঁথে নস্ট্যালজিয়ায় মেদুর গলায়
কবিতার ডাকনাম ধ'রে ডেকেছেন কী ব্যাকুল।

জলের গভীরে ব্যালে উজ্জ্বল মাছের, দেখে দেখে
কেটেছে অনেক বেলা আপনার। সে-ও এক খেলা,
যা' নেয় গোপনে শুষে মেদমজ্জা, জীবনের মধু।
জলের ঈষৎ নড়া অথবা ফাৎনার ডুব দেখে

বুক করতো ধুক পুক। জল ভাগ ক'রে আচমকা
কখনো গিয়েছে বেঁকে ছিপ মধ্যরাতে, তুলেছেন
কত মাছ একান্ত শিল্পিত প্রক্রিয়ায়; মেরুদণ্ডে
গিয়েছে শিরশিরে স্রোত ব'য়ে অগোচরে কখনো-বা

সহসা আপনাকেই নিলো গেঁথে অদৃশ্য বঁড়শিতে
আরেক খেলায় মেতে অন্য একজন, কায়াহীন;
অথচ কী শঠ, ভয়ংকর। যখন লুকিয়ে ছিলো
সে অদূরে বারান্দায় কিংবা বাথরুমে অন্ধকারে,

তখন না-লেখা কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা আপনাকে
ঘিরে ধরেছিলো বুঝি জোনাকির মতো, হয়তো বা
লণ্ঠনের রঙিন মেমো, কবিতার পাণ্ডুলিপি বুকে
করছিলো গলাগলি নাকি সুধীন্দ্রনাথের স্মৃতি

অকস্মাৎ জেগে উঠেছিলো দীপ্র, যেমন ঢেউয়ের
অন্তরালে দ্বীপ, হয়তো অসমাপ্ত বাক্য সে মুহূর্তে
মগজের কোষে কোষে হয়েছে মায়াবী প্রতিধ্বনি।
শব্দেই আমরা বাঁচি এবং শব্দের মৃগয়ায়

আপনি শিখিয়েছেন পরিশ্রমী হতে অবিরাম।
অফলা সময় আসে সকলেরই মাঝে মাঝে, তাই
থাকি অপেক্ষায় সর্বক্ষণ। যতই যাই না কেন দূরে
অচেনা স্রোতের টানে ভাসিয়ে জলযান,

হাতে রাখি কম্পাসের কাঁটা; ঝড়ে চার্ট
কখন গিয়েছে উড়ে, চুলে চোখে-মুখে রুক্ষ নুন,
অস্পষ্ট দিগন্তে দেখি মুখ। আপনার ঋণ
যেন জন্মদাগ কিছুতেই মুছবে না কোনো দিন।

নিদ্রাতুর আঙুলের ফাঁক থেকে কখনো হঠাৎ
সিগারেট খ'সে গেলে চমকে উঠে দেখি মধ্যরাতে—
স্মৃতির মতন এক অনুপম স্বপ্নিল বারান্দা
থাকে পড়ে অন্তরালে অন্তহীন, কবি নেই তার।

এখন আমি

এখন আমি কারুর কোথাও যাবার কথা
শুনলে হঠাৎ চমকে উঠি,
এক নিমেষে ছলছলিয়ে ওঠে কেমন বুকের পুকুর।
কোথায় যাবে? কেন যাবে? এমনিতরো প্রশ্ন শুধু
চোখের তারায়, ঠোঁটের রেখায়
কাঁপতে থাকে।

কারুর দিকে হাত বাড়ালে হাত স'রে যায়
দুঃখভেজা মেঘ-আড়ালে।
যখন-তখন
মনের আপন খুঁটি ভীষণ প্রকম্পিত।
এখন আমি কারুর কোথাও যাবার কথা
শুনলে হঠাৎ চমকে উঠি।

এখন আমি একটা কিছু ভেঙে যেতে দেখলে বিষম
ভেঙে পড়ি।
গোলাপ ফুলের চারাটা তার সজীবতা
খোয়ালে খুব ভয় পেয়ে যাই—
বালক বেলার দুর দুপুরে কাটা ঘুড়ির দৃশ্য আবার
যখন-তখন মনে পড়ে।

অনেকগুলো মৃত ঘোড়া শৈশবেরই ভুবনজোড়া
দীর্ঘ ঘাসে উল্টো পাল্টা থাকে পড়ে—
এখন অমি এমন কিছু ভাবলে ভীষণ
ভয় পেয়ে যাই।

বেশ তো থাকি সময় সময় আবছা আলোয় গৃহকোণে
বইয়ের পাতায় মাথা গুঁজে।
মাঝে মাঝে ঝরা পাতার ফিসফিসানি
বয়স বাড়ার খবর রটায়।
বয়স্য কেউ সূর্য ডোবার মতো হঠাৎ ডুবে গেলে,
অন্ধকারে মনের সঙ্গে
একা দোকা খেলে কাটাই ক্লান্ত বেলা।
দুঃখ কেবল দুঃখ হয়ে ফেলে গভীর দীর্ঘ ছায়া
মুখের রেখায়—
তখন বুকের ভেতর শুধু একলা লাগে,
একলা লাগে।

ছেলেবেলা থেকে

ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু সহসা হারিয়ে ফেলে আমি
ভারি দুঃখ পাই।
একটি রঙিন বল একদা কলকাতা থেকে এনে
আব্বা উপহার দিয়েছিলেন আমাকে

একদিন সে-বল কোন্ শীতের বিকেলে
ছাদ থেকে প'ড়ে
গড়াতে গড়াতে
গড়াতে গড়াতে
কোথায় অদৃশ্য হ'লো, পাইনি কখনো আর খোঁজ।
ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু সহসা হারিয়ে ফেলে আমি
ভারি দুঃখ পাই

একটি সফেদ হাঁস ছিলো ভ্রাম্যমাণ
উঠোনে অথবা বারান্দায়,
ছিলো শৈশবের ছায়ায় আমার গৃহপালিত রোদ্দুরে আর
আমার সবুজ স্নেহ খেতো প্রতিদিন খুদকুড়োর সহিত।
ক্ষুধার্ত প্রহরে
একদিন সহসা তার পালকবিহীন
কতিপয় লালচে ভগ্নাংশ
খাবার টেবিলে এলো ভয়ানক বিবমিষা জাগিয়ে আমার।
ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু সহসা হারিয়ে ফেলে আমি
ভারি দুঃখ পাই।

নেহার, আমার বোন, সত্যেন দত্তের ছিন্নমুকুল পড়ার
বয়সে আঁধারে ঝ'রে আমার ভেতর
অতিশয় কালো বৃষ্টি সে কবে ঝরালো,—
কিছুদিন আমি খুব একা বোধ করেছি একেলা।
ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু সহসা হারিয়ে ফেলে আমি
ভারি দুঃখ পাই।

অরুণ, সুনীল, সুবিমল, সূর্যকিশোর, তাহের,
শিশির, আশরাফ আর কয়েকটি নাম, শুধু নাম,
মাঝে-মধ্যে জোনাকির মতো জ্বলে আর নেভে।
ধূসর কিশোর সব সহপাঠী কোথায় যে করেছে প্রস্থান।

ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু সহসা হারিয়ে ফেলে আমি
ভারি দুঃখ পাই।

আমার মনের শাদা ক্রমাগত কালোর দখলে
যাচ্ছে চ'লে, যাবে।
সম্প্রতি পীড়িত পাপবোধে ; হে সময়,
কখনো তোমার প্রতি উদাস বিলাপ
করি নিবেদন।
ভাঙা মিছিলের মতো একেকটি আমি
দিকচিহ্নহীন পথে পলাতক, আজ অন্য আমি হ'য়ে আছি।
ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু সহসা হারিয়ে ফেলে আমি
ভারি দুঃখ পাই।

তোমার সান্নিধ্যে কিংবা তুমিহীনতায়
কাটে বেলা ; পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ সৈনিক
যেমন কম্পিত হাতে রণক্লান্ত ঠোঁটে রাখে শেষ সিগারেট
তেমনি আঁকড়ে ধরি আজকাল একেকটি দিন আর ভাবি,
সহসা তোমাকে হারানোর দুঃখ যেন, হে মহিলা,
কখনো না পাই।

তোমার স্মৃতি

বুকের ভেতর সাঁকো ভাঙে, ঘর পুড়ে যায়, ইতস্তত
ভস্ম ওড়ে কিংবা কোনো
প্রাচীন গানের রেশ থেকে যায়।
বুকের রুক্ষ ধূসর পথে কখন কে যে উদাস ডাকে।
দেয়াল থেকে চোখ ফিরিয়ে ফের কখনো
অন্ধকারে দেখি মৃত শিশুর মতো
ছিন্নভিন্ন একলা বাদুড় হিম মেঝেতে প'ড়ে থাকে।
জ্যোৎস্নামাখা ঊর্ণাজালের মতো স্মৃতি, তোমার স্মৃতি
হৃদয় জুড়ে কেমন হু-হু বিষাদ গীতি।

রাস্তাজোড়া হাঁসের মিছিল, দোলা যেন হাজার হাজার
শুভ্র ঢেউয়ের ; হঠাৎ লোকে
পথ ছেড়ে দেয় সবিস্ময়ে।
ট্রাফিক পুলিশ ঠোঁটের কোণে বাঁশি গুঁজে শূন্যে ভাসে।
ছিন্ন মেঘে ব্যাণ্ড মাস্টার লাঠি ঠোকে,
বাদ্যরবে পথ হয়ে যায় ফুলের বাজার।
পাখির সঙ্গে শ্বেত করোটি মত্ত নাচে নীল আকাশে।
জ্যোৎস্নামাখা ঊর্ণাজালের মতো স্মৃতি, তোমার স্মৃতি
হৃদয় জুড়ে কেমন হু-হু বিষাদ গীতি।

সুদূর আমার ছেলেবেলার ম্যাজিকঅলা ফুল্ল ঢোলা
কোর্তাপরা বানর হ'য়ে
ডুগডুগিটা বাজায় হেসে।
স্বপ্নাবেশে সিগারেটের শরীর পোড়াই কয়েকখানা ;
হঠাৎ দেখি ভিয়েতনামের জলাশয়ে
করে সে শরীর আছে প'ড়ে কাদায় ঘোলা ;
মগজে তার শূন্য বোবা হাত-পাগুলো দিচ্ছে হানা।
জ্যোৎস্নামাখা ঊর্ণাজালের মতো স্মৃতি, তোমার স্মৃতি
হৃদয় জুড়ে কেমন হু-হু বিষাদ গীতি।

আমি অনাহারী

কবিকে দিও না দুঃখ

কবিকে দিও না দুঃখ, দুঃখ দিলে সে-ও জলে স্থলে
হাওয়ায় হাওয়ায়
নীলিমায় গেঁথে দেবে দুঃখের অক্ষর। কবি তার নিঃসঙ্গতা
কাফনের মতো মুড়ে রাখে আপাদমস্তক, হাঁটে
ফুটপাতে একা,
দালানের চূড়ায় চূড়ায়, দিগন্তের অন্তরালে
কেমন বেড়ায় ভেসে, চাঁদের নিকট যায়, নক্ষত্র ছিটোয় যত্রতত্র
খোলামকুচির মতো। তাকে দুঃখ দিও না, চৌকাঠ থেকে দূরে
দিও না ফিরিয়ে।
ফেরালে নক্ষত্র, চাঁদ করবে ভীষণ হরতাল, ছায়াপথ তেজস্ক্রিয়
শপথে পড়বে ঝরে, নিমেষেই সব ফুল হবে নিরুদ্দেশ।

প্রায়শ পথের ধারে ল্যাম্পোস্টে হেলান দিয়ে খুব
প্রচ্ছন্ন দাঁড়িয়ে থাকে, কখনো বা সীমাহীন রিক্ততায়
রেস্তোরাঁয় বসে
বান্ধববিহীন বিষাদের মুখোমুখি
নিজেই বিষাদ হ'য়ে। মাঝে-মধ্যে চোরাস্তায় খুঁড়ে তোলে এক
গোপন ফোয়ারা পিপাসার্ত পথিকেরা আঁজলা ভরবে ব'লে।
আবার কখনো তার মগজের উপবনে লুকোচুরি খেলে
খুনী ও পুলিশ।

মধ্যরাতে শহরের প্রতিটি বাড়ির দরজায় কিছু ফুল
রেখে আসে নিরিবিলি কাউকে কিছু না ব'লে। কবি সম্মেলনে
রাজধানী আর মফস্বলে স্টেজে কয়েক ডজন
পঙ্‌ক্তির জ্যোৎস্নায় রৌদ্রে পুনবায় স্নান সেরে স্বকীয় গোপন
ঘুলঘুলিটার
দিকে চোখ রেখে নীলিমার সঙ্গে বাণিজ্যের কথা ভাবে, ভাবে
সুদূর অনন্ত তাকে চোখ টিপে বেঘোরে ঘোরাবে কতো আর?

কবি সম্মেলনে তেজী যুবরাজ, প্রেমের নিকট বাস্তবিক
বড়ো নগ্ন, বড়ো অসহায়।

কবিকে দিও না দুঃখ, স্বপ্নের আড়ালে তাকে তীব্র
আবৃত্তি করতে দাও পাথর, পাখির বুক, গাছ,
রমণীয় চোখ,
স্তব্ধ হেঁটে যেতে দাও ছায়াচ্ছন্ন পথে, দাও সাঁতার কাটতে
বায়ুস্তরে একা,
অথবা থাকতে দাও ভিড়ে নিজের ভেতরে। রোজ
হোক সে রূপান্তরিত বার বার। নিজস্ব জীবন রেখেছে সে
গচ্ছিত সবার কাছে নানান ধরনে অকপট।
কবিকে দিও না দুঃখ, একান্ত আপন দুঃখ তাকে
খুঁজে নিতে দাও।

আমি অনাহারী

আমাকে তোমরা দেখলে না? আমার বুকের পাশে
জামতলা, সর্ষে ক্ষেত, মেঘের মতন ঘাসে ঘাসে
প্রজাপতি; রাজধানী আমার দু'চোখে অস্ত যায়।
আমার পড়শি নেই, আরশিও চুরমার; এ ভীষণ নিরালায়
প'ড়ে থাকি। গোলাপজলের মতো স্নিগ্ধ করুণা এখন তাড়াতাড়ি
দেবে কি ছিটিয়ে দূর থেকে? পিপাসার্ত রইবো আমি অনাহারী।

আমাকে তোমরা দেখলে না, সরল রেখার মতো প'ড়ে আছি
কবে থেকে একা একবিংশ শতাব্দীর খুব কাছাকাছি।
যতই মুর্দাফরাশ ডাকো,
বাঘের মতন হাঁকো,
সরবো না এক চুলও। শেষতক
জন্তুতে আমাতে ঠিক কতটা ফারাক, বলবেন গবেষক।
তণ্ডুল করিনি স্পর্শ কতদিন, ছুঁইনি কোমল কোনো নারী;
হাওয়ায় হাওয়ায় রটে দিনরাত, আমি অনাহারী।

ওখানে কী আছে আমি দেখে যেতে চাই। বার বার
দিয়েছো ফিরিয়ে দ্বারপ্রান্ত থেকে ; আর
যাবো না ব্যথিত ফিরে অভিমানে। আমি শস্ত্রপাণি,
দেখছো না ? নৈরাশ এবং ভয় করেছি রপ্তানি
নিরুদ্দেশে, অন্ধ
হলেও রাখবো চোখ মেলে ঠিক, দেখে নিও। সব দিক বন্ধ ?
শুনবো না মানা, হেঁই দ্বারী—
ঝটপট্ হটো, ভেতরে না গিয়ে মরবো না আমি অনাহারী।

একটি বিনষ্ট নগরের দিকে

অচেনা জ্যোৎস্নায় বুঝি এসে গেছি। চতুর্দিকে ঘোড়ার কংকাল
ঝুলে আছে, দরজায় ঊর্ণাজাল ; এখানে সেখানে
বিষণ্ণ কাদার মূর্তি এলোমেলো, অসংখ্য বাতিল ট্রাকে, বাসে
এলাহি বল্মীক আর রাশি রাশি উজাড় বোতল সবখানে।
হে পুরুষ, হে মহিলা, আপনারা কোথায় এখন, কোন্ দূরে ?

দশকে চার দিয়ে গুণ ক'রে আমার বয়স আরো কিছু দূর
হেঁটে যায়, কী একাকী পদচিহ্ন পড়ে শহরের পথে পথে,
প্রচ্ছন্ন গলিতে।
শহরের সব দুঃখ আমার মুখের ভাঁজে ভাঁজে
গাঁথা : আমি দুঃখের বাইরে চলে যেতে চেয়ে আরো
বেশি গাঢ় দুঃখের ভেতরে চ'লে যাই, যেন কোনো
একা আদি মানবের বেলাশেষে নিজের গুহায়
নিঃশব্দ প্রস্থান।

বারুদমণ্ডিত কাঠিগুলি একে একে পুড়ে গেলে দেশলাই
খুব শূন্য থেকে যায়, অনুরূপ শূন্যতায় ভোগে
এ মূক শহর সারাবেলা ; ট্রম্বোন দূরের কথা, এমন কি
দিক্প্রিয় পুলিশের বাঁশিও যায় না শোনা কোথাও এখন।

একটি বিনষ্ট নগরের দিকে চেয়ে থাকা কী যে
শিরাবিদারক মুহূর্তের চাপ স'য়ে যাওয়া। রুক্ষ
জনশূন্যতায় পথ ফেলে দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন।
ঘূর্ণ্যমান পুরোনো কাগজ
ল্যাম্পোস্টের নিচে খুব শীতকাতুরে পাখির মতো
পড়ে আছে, গাছগুলি বিধ্বস্ত পাথুরে মূর্তি যেন।
নৈঃশব্দ্যের দীর্ঘ জিভ কেবলি চাটছে বাড়িঘর,
সারি সারি ধাম,
যেমন কামুক
তন্ময় লেহন করে মেয়েমানুষের ঊরু। যে-জীবন করিনি যাপন
তারই ছায়া দুলে ওঠে, দুলে ওঠে মহা ব্যালে। কেন মুছে যায়?
নৈঃসঙ্গে বিলুপ্তিবোধ তীব্র হয়, বড়ো তীব্র হয়।

বেসিনে বেসিনে ধুলো পুরু হ'য়ে জমে নিশিদিন,
রক্তিম আরশোলা ঘোরে মেঝেতে দেয়ালে, ঝাঁক ঝাঁক।
মুর্গী রান্না হ'য়ে প'ড়ে আছে ঠাণ্ডা রন্ধনশালায়,
খাবার টেবিলে নিঃসঙ্গতা, মেঘের মরুতে ভাসমান স্মিত
চার্বাকের খুলি।
শুধু একজন কী খেয়ালে দেয়ালের দিকে মুখ রেখে তার
গোসলখানার চৌবাচ্চায় ছিপ ফেলে প্রহরের পর
প্রহর দাঁড়ানো।

বিদঘুটে মরুচারী পাখি দেখি ছাদে ও কার্নিশে, শত শত;
ওদের ক্ষুধার্ত চোখে সিমুমের স্মৃতি আর দীপ্র মরীচিকা।
'ফুটপাতে কতকাল পড়ে না মানুষী পদচ্ছাপ', ব'লে ওরা
শহরের শীর্ষে ওড়ে পাখায় বাজিয়ে অট্টহাসি বার বার।
হঠাৎ অসুস্থ লাগে খুব; তাহলে কি ওরা সব, এলেবেলে
এই শহরের নাগরিকবৃন্দ, মৃত অনুরূপ অসুখেই?

শূন্যতায় তুমি শোকসভা

আমিও তোমারই মতো

আমিও তোমারই মতো রাত্রি জাগি, করি পায়চারি
ঘরময় প্রায়শই, জানালার বাইরে তাকাই,
হাওয়ায় হাওয়ায় কান পাতি, অদূরে গাছের পাতা
মর্মরিত হ'লে ফের অত্যন্ত উৎকর্ণ হই, দেখি
রাত্রির ভেতরে অন্য রাত্রি, তোমার মতোই হু হু
সত্তা জুড়ে তৃষ্ণা জাগে কেবলি শব্দের জন্যে আর
মাঝে মাঝে নেশাগ্রস্ত লিখে ফেলি চতুর্দশপদী,
শেষ করি অসমাপ্ত কবিতা কখনো ক্ষিপ্র ঝোঁকে।

কোনো কোনোদিন বন্ধ্যা প্রহরের তুমুল ব্লিজার্ডে
ভুরুতে তুষার জমে, হয়ে যাই নিষ্প্রাণ জমাট
রাজহাঁস যেন, দিকগুলি আর হয় না সংগীত।
অবশ্য তোমার তটে উজ্জ্বল জোয়ার রেখে গেছে
রত্নাবলী বার বার। যখনই তোমার কথা ভাবি,
প্রাচীন রাজার সুবিশাল তৈলচিত্র মনে পড়ে।

তোমার অমিত্রাক্ষর হিরণ্ময় উদার প্রান্তর,
তোমার অমিত্রাক্ষর সমুদ্রের সুনীল কল্লোল,
তোমার অমিত্রাক্ষর ফসলের তরঙ্গিত মাঠ,
তোমার অমিত্রাক্ষর ধাবমান স্বপ্ন-অশ্বদল,
তোমার অমিত্রাক্ষর নব্যতন্ত্রী দীপ্র বঙ্গভূমি,
তোমার অমিত্রাক্ষর উন্মথিত উনিশ শতক।

হেনরিয়েটার চোখে দেখেছিলে কবিতার শিখা?
না কি কবিতাই প্রিয়তমা হেনরিয়েটার চোখ?
হাসপাতালের বেডে শুয়ে সে চোখে অস্তরাগে
তুমি কি খুঁজেছো কোনো ট্রাজেডির মেঘ? হয়তো বা
অভ্যাসবশত বেডে অসুস্থ আঙুল ঠুকে ঠুকে

আস্তেসুস্থে বাজিয়েছো ছন্দ মাঝে-মাঝে, বাষ্পাকুল
চোখে ভেসে উঠেছিলো বুঝি দূর কাব্যের কানন।
কখনো দেয়ালে ক্লান্ত চোখ রেখে হয়তো ভেবেছো—
কী কাজ বাজায়ে বীণা? এ আঁধারে কিবা মাইকেল
কি মধুসূদন কার প্রকৃত অস্তিত্ব অনন্তের
নিরুদ্দেশে রেণু হ'য়ে ঝরে, কে বলে দেবে, হায়।

আমিও তোমারই মতো প্রাদেশিক জলাভূমি ছেড়ে
দূর সমুদ্রের দিকে যাত্রা করি, যদিও হোঁচট
খেয়ে পড়ি বারংবার। রক্তে নাচে মায়াবী য়ুরোপ
ইতালী ভ্রমণ ক'রে, সুদূর গ্রীসের জলপাই
পল্লবে বুলিয়ে চোখ, বুলেভার ছেড়ে ফিরে আসি
সতত আপন নদে তোমার মতোই কী ব্যাকুল—
আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কপোতাক্ষ আছে।

পারিপার্শ্বিকের আড়ালে

শামসুর রাহমান ব'লে আছে একজন, যার
জন্যে মধ্যরাতে কোনো নদী,
মাছের মতন চকচকে কোনো স্বপ্নাবৃত প্রখর শরীর
বিছানায় একা
অপেক্ষা করছে কিনা, সে জানে না। কোথাও এখন
দরজা জানালা তার জন্যে খোলা আছে কিনা কিংবা
অন্ধকার ইস্কুলে আলো জ্বেলে কেউ চক্ষুষ্মান খুব
ধৈর্যভরে ব'সে আছে কিনা,
সে জানে না। জানে তার মনের নিভৃত ছায়াচ্ছন্ন
ঘাটে কী সুদূর
অরণ্যের প্রাণীর মতন পানি খেতে আসে স্মৃতি। জানে তাকে
সারারাত এলোমেলো জাগিয়ে রাখবে অলৌকিক হুইসিল।

শামসুর রাহমান ব'লে আছে একজন, নিজের কাছেই
বন্দী সর্বক্ষণ।
প্রতিদিন শহরের সবচেয়ে করুণ গলির মুখচ্ছবি
মুখের রেখায় নিয়ে হাঁটে ফুটপাতে,
সুনিবিড় রিশ্‌তা তার রহস্য নামক অতিশয়
লতাগুল্মময় প্রান্তরের সাথে কেমন অচিন
দৃশ্যাবলি সমেত বিপুল
অদৃশ্যের সাথে।
একদিন মরে যাবে ভেবে তার মনের ভেতরে
আবর ঘনায় একরাশ, মনোবেদনার রেখা
ফোটে মুখমণ্ডলে গভীর,
কিছুকাল এভাবেই কাটে, ফের চকিত আনন্দে নেড়ে দেয়
সময়ের থুতনি ঈষৎ।

বয়স বাড়ছে তার, বাঁচলে কার না বেড়ে যায়?
নিজেকে শুধায় সে-ও প্রায়শই— হৃদয় সতেজ রাখা চাই,
নইলে কবিতার সূক্ষ্ম শিকড় কংকালসার হবে।
কবিতার জন্যে তাকে উন্মাদ হ'তেই হবে, আজো মানে না সে
অবশ্য একথা ঠিক, কোনো কোনো কবি মানসিক
ব্যাধিতে ভুগেও কাগজের শূন্যতায় এনেছেন
পাখির বুকের তাপ, দুপুরের হলুদ নিশ্বাস,
তন্দ্রিল সংগীতময় দ্বীপপুঞ্জ, বাঘের পায়ের ছাপ আর
প্রাচীন দুর্গের সিঁড়ি, দেবদূত, অজানার দ্যুতি;
জীবনকে দিয়েছেন বাস্তবিক স্বপ্নের গড়ন।

শৈল্পিক ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ঘোরে দিগ্বিদিক,
নিজেকে লুকিয়ে রাখে স্বরচিত কুয়াশায় আর
করে সে উজাড় পাত্র বার বার ইয়ারের সাথে।
নিজের আড়ালে তার একজন স্বতন্ত্র মানুষ
স্বপ্নের রঙের মতো মুখ নিয়ে ব'সে থাকে একা,
জানে না কখন উঠে যাবে ফের আপন পুশিদা

আস্তানায় ; জানে না সে কোথায় যে নিরাময় তার
হাসপাতালের বেডে নাকি কোনো নারীর হৃদয়ে।

শামসুর রাহমান ব'লে আছে একজন, যার
প্রতি ইদানীং
বিমুখ নারীর ওষ্ঠ, শিল্পকলা বাগানের ফুল।
সবাই দরজা বন্ধ ক'রে দেয় একে একে মুখের ওপর,
শুধু মধ্যরাতে ঢাকা তার রহস্যের অন্তর্বাস খুলে বলে—
ফিরে এসো তুমি।
মধ্যরাতে ঢাকা বড়ো একা বড়ো ফাঁকা হ'য়ে যায়,
অতিকায় টেলিফোন নেমে আসে গহন রাস্তায় জনহীন
দীর্ঘ ফুটপাত
ছেয়ে যায় উঁচু উঁচু ঘাসে আর সাইনবোর্ডের বর্ণমালা
কী সুন্দর পাখি হ'য়ে রেস্তোরাঁর আশপাশে ছড়ায় সংকেত
একজন পরী হ্যালো হ্যালো ব'লে ডায়াল করছে অবিরাম
মধ্যরাতে ঢাকা বড়ো একা বড়ো ফাঁকা হয়ে যায়।

প্রশ্নোত্তর

যখন আড়ালে পথ চলি,
'কী খবর, আরে, বলুনতো কী খবর'
প্রশ্ন করে গাছপালা, পাখি, আমি বলি—
প্রেরণাবিহীন কবি রুদ্ধশ্বাস বন্ধ ডাকঘর।

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি, নিথর বিশাল,
মাটি ফুঁড়ে জেগে ওঠে গভীর রাত্তিরে।
মুখে শতাব্দীর গাঢ় বিশদ শ্যাওলা আর ভীষণ ফাটল,
যেন বেদনার রেখা। ব্রোঞ্জের অদ্ভুত চক্ষুদ্বয় খুব স্থির
চেয়ে থাকে অন্ধকারে; মনে হয়, ওরা কোনোদিন
দ্যাখেনি কিছুই,
যদিও দ্যাখার কথা ছিলো শতাব্দীর মতোই ব্যাপক বহু কিছু।
কী যেন বলতে চায় সেই মূর্তি, কণ্ঠস্বর তার স্তব্ধতায়
টোকা দিতে চেয়ে
হাওয়ায় হারায়, দু'টি হাত বুঝি ধ'রে রেখেছে অতীত কিছু।
ব্রোঞ্জমূর্তি প্রশ্নচিহ্ন, উত্তরবিহীন; ঘাস ক্ষিপ্র চাটে তার পদযুগ।

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে বনপোড়া একটি হরিণী
ছোটে দিগ্বিদিক, তীব্র তৃষ্ণায় কাতর, জলাশয়ে মুখ রেখে
মরুর দুরন্ত দাহ মেখে নেয় বুকে এবং আপনকার
মাংস আর হাড়ের ভেতরে
সে ঘুমায় নিরিবিলি। বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে— জুয়ার টেবিলে
সহসা নক্ষত্র ঝরে, সন্ত সন্ত ব'লে জুয়াড়ীরা
শূন্যের উদ্দেশে
তোলে হাত, কখন যে হাত বেয়ে সাপ নেমে আসে,
উত্তেজনাহেতু
কিছুতে পায় না টের, ভাবে দ্রাক্ষালতা জীবনের
ওষ্ঠে দেবে ফেলে কিছু সোনালি মদিরা বেলাবেলি।

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে— মধ্যরাত্রির শহরে একা
সুনীল জাহাজ
সহজে প্রবেশ করে, নাবিকেরা গাঙচিল হ'য়ে
কলোনির, বাণিজ্যিক এলাকার ছাদে ছাদে ওড়ে,

একজন অন্ধ ক্রূর বণিকের হাতে বাজ পাখি ;
নগর পুলিশ অফিয়ুস নাকি ব'লে কেউ কেউ
করোটিতে তবলা বাজায়।

বাংলাদেশ স্বপ্ন ছাখে মৃত শিশু মেঘে ভাসমান ক্ষমাহীন,
কার্পেটের তলা থেকে, জানালার পুরু পর্দা থেকে,
টেলিগ্রাম আর কিছু পুরোনো চিঠির তাড়া থেকে
এবং মাছের পেট থেকে নারী আর শিশু আসে ভেসে ভেসে,
মেহেদী পাতার ভিড় থেকে, বেলুনের ঝাঁক থেকে
নারী আর শিশু ভেসে আসে। বাংলাদেশ স্বপ্ন ছাখে
পতাকার নিচে কত আহত প্রেমিক নতজানু
গোধূলিতে, চতুর্দিকে উন্মাদের পদধ্বনি, কার সে বাঁশিতে
নস্ট্যালজিয়ার মতো সুর, কী সুন্দর প্রাণী পথের ধুলায়
বিকলাঙ্গ, ক্লাউনের টুপি সবুজ ঘোড়ার পায়ে পায়ে ঘোরে,
ক্লাউন কফিনে ব'সে পিট পিট চেয়ে থাকে ভীষণ একাকী।
বৃষ্টি পড়ে রঙ-করা গালে তার, বৃষ্টি পড়ে মৃত্যুর পাহাড়ে।

বাংলাদেশ স্বপ্ন ছাখে— কতিপয় লোক দেবদূতের নগ্নতা
বড়ো বেশি কাম্য ভেবে উন্মাদের মতো নগ্ন হ'য়ে যায়,
তরুণীর ওষ্ঠে বার-বার চুমো খায় কর্কশ কংকাল আর
লোহিত বনের ধারে পাথরের ঘোড়ায় সওয়ার
অত্যন্ত পাথুরে যোদ্ধা, স্তব্ধ অস্ত্রে চির-জ্যোৎস্না বয়।
বাংলাদেশ স্বপ্ন ছাখে একজন অসুস্থ নৃপতি শয্যাশায়ী
একটি সোনালি খাটে, অলৌকিক ফলের আশায়
প্রহর ফুরায়, তাহলে কি দীপ নিভে যাবে গহন বেলায় ?
কোন্ তেপান্তরে আজ হাঁপাচ্ছে বিশীর্ণ পক্ষিরাজ,—
ভাবেন নৃপতি, চোখ বুজে আসে, তৃতীয় কুমার তাঁর এখনো ফেরেনি।

আমার বয়স আমি

আমার বয়স আমি পান ক'রে চলেছি সর্বদা। বয়সের
ওষ্ঠে ঠোঁট রেখে দেখি দূরে
বয়স দাঁড়িয়ে থাকে বালকের মতো
আলোজ্বলা গলির ভেতরে,
কখনো আর্মেনিয়ান গির্জের সমীপবর্তী মাঠে
বৃষ্টিভেজা কিশোরের ভঙ্গিমায়, কখনোবা রোদে
আমার বয়স যুবা ভাঙা মন্দিরের পাশে থরথর বুকে
নিসর্গ, নারীর কাছে সমর্পিত। এখন তোমরা যারা খুব
জ্বলজ্বলে তীরে ব'সে গপ্পো করো হাওয়ায় উড়িয়ে
বাদামের খোসা,
বাতাসের মুখে দাও মেখে গোল্ড-ফ্লেক-ঘ্রাণ কিংবা
মধ্যরাতে শহরের পথে ছাখো সুনীল নাবিক,
ছাখো নিজেদের স্বপ্ন হেনরী মুরের
মূর্তির ভেতরে নিরালয় কী সবুজ ঘুমোয় এবং শোনো
শ্মশানে সানাই.
তাদের নিকট এই বয়স আমার গালগল্প কিংবা কোনো
ম্যানিফেস্টো, এলেবেলে ভাষায় রচিত।

আমার বয়স আজ চায়ের কাপের ঠোঁটে সাতচল্লিশটি
চুমো খায়, পদযুগ দেয় মেলে ডাগর সূর্যাস্তে,
এক বুক জলে একা দাঁড়িয়ে কখনো ছাখে সূর্যোদয় আর
কখনো টেবিলে হাত, হাতে ঠেকিয়ে চিবুক
আমার বয়স পড়ে অপরূপ মানচিত্র আকাঙ্ক্ষার, সুদূর স্বপ্নের
মাঝে-মাঝে বয়সের চোখের পাতায় ক্যাকটাস
বসায় বিষাক্ত দাঁত, অকস্মাৎ বয়সের মাথা থেকে
খুশ্‌কি ঝ'রে যায়, খুশ্‌কি ঝ'রে যায়, খুশ্‌কি ঝ'রে যায়।

আমার বয়স গোনে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত
আট নয় দশ

এক দুই তিন চার, গোনে শুধু গোনে, মাঝে-মধ্যে
কড়িকাঠে রাখে চোখ, রাখে
আস্তিনে উচ্ছিষ্ট কণা স্বাপ্নিকের, অজস্র বিমর্ষ কাকাতুয়া
তার বুকে নেমে আসে। আমার বয়স ঘোরে গোলকধাঁধায়,
ছাখে কিছু নেই, এমন কি ক্রূর মিনোটরের অস্পষ্ট
পদচ্ছাপও নেই।

আমার বয়স কাশে একা ঘরে মধ্যবয়সের
তামাটে প্রহরে
এবং পেশেন্স খেলে, বেড়ালের পিঠে হাত রেখে
কখনো ভাবুক হয়, মুখ ধোয় স্বপ্নের বেসিনে বারংবার।
আমার বয়স কাঁধে ঈগল-কপোত নিয়ে হাঁটে
ফুটপাতে, কখনোবা থমকে দাঁড়ায়, যেন কোনো
একান্ত নিঃসঙ্গ ঘোড়া মোটরের ভিড়ে;
কখনো সিংহের পিঠে চ'ড়ে বেড়ায় সমুদ্রতীরে
আয়ুভূক বয়স আমার।

আমার বয়স শার্ট, ট্রাউজার গেঞ্জি, আণ্ডারওয়ার খুলে
মেঝেতে গড়ায়, ভাবে কেন এত হিংসাদ্বেষ গ্রন্থের পাতায়?
কেন হু হু জল অবিরল পাবলিক লাইব্রেরির দু'চোখ বেয়ে ঝরে?
ফুটপাতগুলি কেন এমন ঔদাস্যে ভরপুর?

আমার বয়স জন্মশাসনের বিজ্ঞাপনগুলিকে নিমেষে
বানায় বৈষ্ণব পদাবলী
বন্দুককে ম্যাণ্ডোলিন, জংধরা কৌটাকে ললিপপ।
আমার বয়য় চোখ হ'লে পরিপার্শ্ব হ'য়ে যায় সহসা ডিজনি ল্যাণ্ড,
আমার বয়স চোখ হ'লে ক্লোজ শট, মিড শট, লং শটে
বিভক্ত, সম্পূর্ণ ফের চিত্রময় বিশদ জগৎ।

কারা কী ফোড়ন কাটে বাঁকা চোখে তাকায় ক'জন,
কারা করে নফরৎ ইত্যাদিকে কখনো দেয় না পাত্তা আমার বয়স।

বলে সে, কী লাভ এই খিস্তি খেউড়ের প্রতি মনোযোগী হ'য়ে ?
বরং রঙিন নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াবো একা-একা
অথবা ঝরনার পাশে শুয়ে শুনবো পাখির রাঙা
প্রেমালাপ, কারো মুখচ্ছবি—ফেড ইন—
স্বপ্নের জোয়ারে
আসবে সোনালি ভেসে। আমার বয়স কিছু ফেড আউটের
স্মৃতি ব'য়ে দূরবর্তী স্বর্ণরেখার দিকে ছুটে যায়।

আমার বয়স কৃষকের রৌদ্রদগ্ধ মুখের মতন স্পষ্ট
চেয়ে থাকে ফসলের দিকে,
ছাখে পঙ্গপাল আসে ঝাঁক-ঝাঁক, কী হিংস্র ঝাঁপিয়ে
পড়ে মাঠে সর্বনাশা ক্ষুধায়, মেঘ না পোকামাকড়ের দল, বোঝা দায়।

আমার বয়স আজ কবির চোখের মতো নাচে
চরচরে, যায় দূরে নক্ষত্রটোলায়, পাতালের
অন্ধকারে, মাছ আর বনহংসীর হৃদয়ে আর
কবরের নিস্তব্ধ গভীরে।
আমার বয়স তার করতলে অদৃশ্য মোহর পেয়ে খুশি,
আমার বয়স তস্করের মতো চতুষ্পার্শ্ব থেকে
এলেবেলে কত কিছু নিয়ে যায় ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় স্মৃতির গুহায়।
প্রাচীন পাথর আর লতাগুল্মের ভেতর হেঁটে যেতে যেতে
আমার বয়স ক্রমাগত মেপে চলে
একান্ত আপন মহাদেশ।

ভোট দেবো

তোমার ভোটাধিকার আছে ব'লে ক'জন নিঝুম প্রজাপতি
ক্যানভাসারের মতো উড়ে যায় গহন দুপুরে
আমার চুলের গুচ্ছ ছুঁয়ে, কান ছুঁয়ে।

ব্যালটবাক্সের গায়ে বহুবর্ণ স্বপ্নের কামিজ ঢিলেঢালা,
নানান প্রতীক ওড়ে চতুর্দিকে। স্বর্ণকণ্ঠ পাখিরা এখন
কেবলি স্লোগান গায়, পরীদের নাচ জমে ওঠে
বেবাক ব্যালটবাক্স ঘিরে। ভোট দিন ভোট দিন
ব'লে দেবদূত কতিপয় পা দোলান দূরে অলীক কার্নিশে।

সহসা বিলোন তারা রঙিন পুস্তিকা, ম্যানিফেস্টো,
করি না কখনো পাঠ। সেসব কাগজ, মনে হয়,
নীলিমায় উড়ে যাওয়া ভালো ;
ওরা মেঘে গেলে পাবে ভিন্ন অবয়ব,
কিছুটা সত্যতা পেতে পারে।

কতবার ভোটকেন্দ্র ছেড়ে আমি
এসেছি নিজের খুব কাছে ফিরে, পা মেলে আপন
হৃদয়ের একলা চত্বরে,
নতুন প্যাকেট থেকে তাজা সিগারেট বের ক'রে
খানিক ভেবেছি কারো কথা, ধোঁয়া ছেড়ে
ভেবেছি সমুদ্রে হোমারের আর যেহেতু ইউলিসিস নই,
এসেছি আবার ফিরে জীর্ণ ঘরে মশার গুঞ্জনে,
স্বপ্নের চিবুক ধ'রে শুয়ে থাকি, কখনো চেয়ারে ঢুলি আর
অকস্মাৎ তড়িঘড়ি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা চাই ব'লে করি পায়চারি ঘরময়
কখনো আমাকে ক্ষিপ্র শোঁকে স্বপ্ন, যেমন শশক লতাগুল্ম।
তবু আমি ভোটকেন্দ্রে যাবো, বসবো সহাস্য মুখে
নতুন কাপড়-ঘেরা এলাকায় প্রীত ম্যাজিশিয়নের মতো,
হঠাৎ উড়িয়ে দেবো রুমাল, পায়রা।
ব্যালটপেপারে খুব ঝুঁকে
আমি ভালোবাসাকেই ভোট দিয়ে ঘরে
কিংবা পার্কে যাবো শিস বাজাতে বাজাতে।

প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে

তোর কাছ থেকে দূরে

তোর কাছ থেকে দূরে, সে কোন নিশ্চিন্তপুরে পালাতে চেয়েছি
প্রতিদিন, বুঝলি মতিন !

হয়তো বা টের পেয়ে অবশেষে নিজেই উধাও হয়ে গেলি
একটি নদীর তীরে, মাঠ-ঘেঁষা, গাছ ঘেরা, জুঁই কি চামেলী
ইত্যাদির ঘ্রাণময় বিজন নিবাসে। আমি তোকে
দীর্ঘ চোদ্দ বছরের সাইকেডেলিক স্মরণের তীব্র ঝোঁকে
ডাকি মধ্যরাত্রির মতো বুক ছিঁড়ে বারংবার,
প্রতিধ্বনি শুধু গূঢ় প্রতিধ্বনি ফিরে আসে মগজে আমার।

কেমন আছিস তুই ? এখনো কি ভীষণ অস্থির তুই, ওরে ?
এখনো কি অতি দ্রুত হেঁটে যাস দুঃস্বপ্নের ঘোরে
অলীক অলিন্দে কোনো ? অবাস্তব বনবাদাড়ে ঘুরিস একা
ছিন্ন বেশ, নগ্নপদ সন্তের মতন ? তোর দেখা,
মানে তোর ঝলমলে প্রকৃত সত্তার দেখা পাবো কি আবার
কোনোদিন ? তোকে হারাবার
পর তুই অতিশয় বেগানা আমার বড়ো বেশি উদাসীন
হয়ে গেলি, রূপান্তরে আমার দুঃখের মতো, বুঝলি মতিন।

যখন এখানে ছিলি, বুকের নিকটে ছিলি, তোর হস্তদ্বয়
আমার স্বপ্নের ঝাড়লণ্ঠন বেবাক অতিশয়
হিংস্রতায় বারংবার দিয়েছে দুলিয়ে। চুরমার
হয়েছে এ-ঘরে নিত্য যা কিছু ভঙ্গুর আর প্রগাঢ় সুর্মার
মতো অন্ধকার চোখে নেমে এসেছে আমার ভর দুপুরেই।
এখন এখানে নেই, তুই নেই ; আমার বুকের মধ্যে
সবুজ পুকুর।

এই তো সেদিন আমি খাতার পাতায় মগ্ন ছিলাম একাকী
অপরাহ্নে অক্ষরের গানে তরঙ্গিত। 'সবই ফাঁকি',

কে যেন চেঁচিয়ে বলে। দেখি খুব থমথমে সমুখে দাঁড়িয়ে
কাল-কিশোরের মতো তুই, যেন দীর্ঘ পথ নিমেষে মাড়িয়ে
এসেছিস ব'লে দিতে আমার উদ্যম সব এলোমেলো,
দারুণ বেঠিক।
দিচ্ছিস চক্কর তুই ঘরময়, আমিও ঘুরছি দিগ্বিদিক
জনাকীর্ণ এ শহরে কে জানে কিসের টানে পরিণামহীন,
বুঝলি মতিন!

যখন এখানে ছিলি, ছিলো এক ঝাঁক চিলের ক্রন্দন ঘরে,
ছিলো তীক্ষ্ণ কলরব সকল সময়, মনে পড়ে।
এখন আমার ঘর অত্যন্ত নীরব, যেন শ্লেট, মূক, ভারী।
কখনো চাইনি আমি এমন নিশ্চুপ ঘরবাড়ি।

কেউ কি এখন

কেউ কি এখন এই অবেলায়
আমার প্রতি বাড়িয়ে দেবে হাত?
আমার স্মৃতির ঝোপেঝাড়ে
হরিণ কাঁদে অন্ধকারে,
এখন আমার বুকের ভেতর
শুকনো পাতা, বিষের মতো রাত।

দ্বিধান্বিত দাঁড়িয়ে আছি
একটি সাঁকোর কাছাকাছি,
চোখ ফেরাতেই দেখি সাঁকো
এক নিমেষে ভাঙলো অকস্মাৎ।

গৃহে প্রবেশ করবো সুখে?
চৌকাঠে যায় কপাল ঠুকে।
বাইরে থাকি নত মুখে,
নেকড়েগুলো দেখায় তীক্ষ্ণ দাঁত।

অপরাহ্ণে ভালোবাসা
চক্ষে নিয়ে গহন ভাষা
গান শোনালো সর্বনাশা,
এই কি তবে মোহন অপঘাত ?

কেউ কি এখন এই অবেলায়
আমার প্রতি বাড়িয়ে দেবে হাত ?

রেনেসাঁস

চকচকে তেজী এক ঘোড়ার মতন রেনেসাঁস
প্রবল ঝলসে ওঠে চেতনায়। ক্ষিপ্ত তরবারি,
রৌদ্রস্নাত রণতরী, তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্যপর,
অপক্ব গমের ক্ষেত, আদিগন্ত কালো মহামারী,
অলিন্দে রহস্যময়ী কেউ, দিকে দিকে প্রতিদিন
ভ্রাম্যমাণ অশ্বারোহী মাঝিমাল্লা স্মৃতিতে ভাস্বর।
জেল্লাদার ট্রফি, অসিচালনা অথবা বল্লমের
খেলা—কোনো কিছু নয়, সেকালের মেধার উল্লাস

এখনো আমাকে টানে। তোমার উদ্দেশে কতিপয়
চতুর্দশপদী লিখে, নিশীথের শেষ প্রহরের
ক্ষয়িষ্ণু বাতির দিকে চোখ রেখে শুভ্র সূর্যোদয়
আকণ্ঠ করবো পান, মড়কের প্রতি উদাসীন
অশ্বারূঢ় নাইটের মতো যাবো। সভ্যতার বিভা
উঠবে চমকে জ্যোৎস্নালোকে, জ্বলবে ঘোড়ার গ্রীবা।

অভিমানী বাংলাভাষা

মানুষের অবয়ব থেকে, নিসর্গের চোখ থেকে
এমন কি শাক-সব্‌জি, আসবাব ইত্যাদি থেকেও
স্মৃতি ঝরে অবিরল। রাজপথ এবং পলাশ

যখন চমকে উঠেছিলো পদধ্বনি, বন্দুকের
শব্দে ঘন ঘন, স্মৃতি নিজস্ব বুননে অন্তরালে
করেছে রচনা কিছু গল্প-গাথা, সত্যের চেয়েও
বেশি দীপ্র। কান্তিমান মোরগের মতো মাথা তুলে
কখনো একটি দিন দেয় ডাক, পরিপার্শ্ব দোলে,
মানুষ তাকায় চতুর্দিকে, কেউ কৌতূহলে, কেউ
গভীর তাগিদে কোনো, যেন কিছু করবার আছে,
সত্তায় চাঞ্চল্য আসে। করতলে স্বপ্নের নিভৃত
স্বপ্ন জাগে, প্রত্যেকটি পথ কেমন উৎসব হয়।
মনে পড়ে, দিকচিহ্ন, গেরস্থালি, নক্ষত্র দুলিয়ে
অভিমানী বাংলাভাষা সে কবে বিদ্রোহ করেছিলো।

মুর্গী ও গাজর

এখন আমার সত্তাময় কত ভীষণ আঁচড়।
কত পৌরাণিক পশু আমার সমগ্রে দাঁত-নখ
বসিয়েছে বারংবার ধূমায়িত ক্রোধে। কী প্রখর
চঞ্চু দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক কালো পাখি আমার এ ত্বক
ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলেছে বেবাক, কোনোদিন দেখবে না
তুমি, খেদহীন আমি তোমার ধারণা, বিবেচনা
ইত্যাদির পরপারে আস্তে সুস্থে হেঁটে যাবো, চেনা-
শোনা ছিলো কোনোদিন আমাদের, এই তো সান্ত্বনা।

বিদায়ের ঘণ্টা বাজে হৃদয়ের দিগন্তে এখন।
চড়ায় ঠেকেছে শূন্য রূপসী ময়ূরপঙ্খী নাও,
বৈরী হাওয়া সহসা কাঁপিয়ে দেয় আমার পাঁজর।
দুঃখ নাম্নী যে নিঝুম পল্লী আছে, সেখানে আপন
ডেরা আজো, সংসার পাতো গে তুমি, যাও মেয়ে যাও;
বস্তুত তোমার পথ চেয়ে আছে মুর্গী ও গাজর।

মৃতের মুখের কাছে

মৃতের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলে ভাবনার
স্বরূপ বদলে যায় ? চোখের সম্মুখে বনভূমি,
কাঁটাবন, শীর্ণ নদী, সন্তের ঔদাস্যময় ছিন্ন
আলখাল্লা, এক পাটি জীর্ণ জুতো, দূরবর্তী লাল
টিলা-বেয়ে-নেমে-আসা কেউটে, গহ্বর ভয়ংকর,
অবেলায় ঘরে ফেরা জেগে ওঠে। চৌদিকে বিপুল
বৃষ্টিধারা, ভেসে যায় শিকড় বাকড় নিরুদ্দেশে,
কে যেন একাকী দাঁড় টেনে চলে গহন নদীতে।

মৃতের মুখের কাছে মুখ নিয়ে কিছু গূঢ় কথা
জিগ্যেস করতে সাধ হয়, কিন্তু ভুলে যাই সব।
কমনে অমন প'ড়ে থাকে একা এমন অচিন,
শূন্য খাঁচা স্তব্ধতায় কম্পমান, হায়, গানহীন।
মৃতের মুখের কাছে মুখ নিয়ে দুঃখের ভিতরে
ব'সে থাকি কিছুক্ষণ খুব একা, মেঘ হয়ে যাই।

ইকারুসের আকাশ

ইকারুসের আকাশ

গোড়াতেই নিষেধের তর্জনী উদ্যত ছিলো, ছিলো
সুপ্রাচীন শকুনের কর্কশ আওয়াজে
নিশ্চিত মুদ্রিত
আমার নিজস্ব পরিণাম। যেন ধু ধু মরুভূমি
কিংবা কোনো পানা পুকুরে কি জন্মান্ধ ডোবায়
অস্তিত্ব বিলীন হবে কিংবা হবো সেই জলমগ্ন ভুল প্রত্ন
পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল, উদ্যমপ্রবণ ধীবরের জাল যাকে
ব্যাকুল আনবে টেনে নৌকোর গলুইয়ে—
এইমতো ভয়ংকর সংকেত চকিতে
উঠেছিলো কেঁপে রুদ্ধ গোলকধাঁধায়।

আমি তো বারণ মেনে বিশ্রুত স্থপতি
ধীমান পিতার
পারতাম জলপাই আর বৃষমাংস খেয়ে,
পান ক'রে চামড়ার থলে থেকে উজ্জ্বল মদিরা
এবং নিভৃত কুঞ্জে তরুণীকে আলিঙ্গনে মোহাবিষ্ট ক'রে
ধারালো ক্ষুরের স্পর্শসুখ নিয়ে প্রত্যহ সকালে
সাধারণ মানুষের মতো গোচারণ, শস্যক্ষেত আর
সন্তান লালন ক'রে কাটাতে সময়।
পারতাম সুহৃদের সঙ্গে প্রীতি বিনিময়ে
খুশি হতে, তৃপ্তি পেতে পাতার মর্মরে,
বনদোয়েলের গানে, তামাটে দুপুরে
পদরেখা লাঞ্ছিত জঙ্গলে
নিজেকে নিযুক্ত ক'রে মধু আহরণে।
কী-যে হলো, অকস্মাৎ পেরিয়ে গোলকধাঁধা পিতৃদত্ত ডানা
ভর ক'রে কিছুক্ষণ ওড়ার পরেই
রৌদ্রের সোনালি মদ আমার শিরায়
ধরালো স্পর্ধার নেশা। শৈশবে কৈশোরে কতদিন

দেখেছি পাখির ওড়া উদার আকাশে। ঈগলের
দুর্নিবার ঊর্ধ্বাচারী ডানার চাঞ্চল্যে ছিলো সার
সর্বদা আমার, তাই কামোদ্দীপ্তা যুবতীর মতো
প্রবল অপ্রতিরোধ্য আমার উচ্চাভিলাষ আমাকে অনেক
উঁচুতে মেঘের স্তরে স্তরে
রৌদ্রের সমুদ্রে নিয়ে গেলো। দ্বিধাহীন আমি উড়ে
গেলাম সূর্যের ঠোঁটে কোনো রক্ষাকবচবিহীন
প্রার্থনার মতো।

কখনো মৃত্যুর আগে মানুষ জানে না
নিজের সঠিক পরিণতি। পালকের ভাঁজে ভাঁজে
সর্বনাশ নিতেছে নিশ্বাস
জেনেও নিয়েছি বেছে অসম্ভব উত্তপ্ত বলয়
পাখা মেলবার, যদি আমি এড়িয়ে ঝুঁকির আঁচ
নিরাপদ নিচে উড়ে উড়ে গন্তব্যে যেতাম পৌঁছে
তবে কি পেতাম এই অমরত্বময় শিহরণ?
তবে কি আমার নাম স্মৃতির মতন
কখনো উঠতো বেজে রৌদ্রময় পথে জ্যোৎস্নালোকে
চারণের নৈসর্গিক, স্বপ্নজীবী সান্দ্র উচ্চারণে?
সমগ্র জাতির কোনো কাজে লাগবে না
এই বলিদান, শুধু অভীপ্সার ক্ষণিকের গান
গেলাম নিভৃতে রেখে খাঁ খাঁ শূন্যতায়।
অর্জন করেছি আমি অকাল লুপ্তির বিনিময়ে
সবার কীর্তনযোগ্য গাথা,
যেহেতু স্বেচ্ছায়
করেছি অমোঘ নির্বাচন
ব্যাপ্ত জলজলে, ক্ষমাহীন, রুদ্র নিজস্ব আকাশ:

নিজের কবিতা বিষয়ে কবিতা

আমার কবিতা নিয়ে রটনাকারীরা আশেপাশে
নানা গালগল্প করে। কেউ বলে আমার কাব্যের
গোপনাঙ্গে কতিপয় বেঢপ জড়ুল জাগরূক,
ওঠেনি আক্কেল দাঁত আজো তার, বলে কেউ কেউ।

আমার কবিতা নাকি বাউণ্ডুলে বড়ো, ফুটপাথে
ঘোরে একা একা কিংবা পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে থাকে,
ইন্দ্রিয়বিলাসে মজে বন্ধ কুঠুরিতে, মাঝে মাঝে
শিস দেয়; আমার কবিতা খুব বেহুদা শহুরে।

একরত্তি কাণ্ডজ্ঞান নেই তার, সবার অমতে
সোৎসাহে চাপিয়ে গায়ে আজব জ্যাকেট, কেয়াবাৎ,
সুনীল লণ্ঠন হাতে দিনদুপুরেই পর্যটক
এবং অভ্যাসবশে ঢোকে সান্ধ্য মদের আড্ডায়।

মদের বোতল রুক্ষ গালে চেপে অথবা সবেগে
চুমু খেয়ে অস্তিত্বহীনতা বিষয়ক গান গায়,
এবং মগজে তার নিষিদ্ধ কথার ঝাঁক ওড়ে
মধুমক্ষিকার মতো সকালে কি রাত বারোটায়।

আমার কবিতা অকস্মাৎ হাজার মশাল জেলে
নিজেই নিজের ঘর ভীষণ পুড়িয়ে দেখে নেয়
অগ্ন্যুৎসব; কপোতীর চোখে শোক; এদিকে নিমেষে
উদ্বাস্তু গৃহদেবতা, কোথাও করবে যাত্রা ফের।

বিদ্যের জাহাজ দ্রুত চৌদিকে রটিয়ে দেয়, 'ওর
পদ্যটদ্য এমন কি ইকেবানা নয়, এইসব
আত্মছলনার অতি ঠুনকো পুতুল—টিকবে না,
ভীষণ গুঁড়িয়ে যাবে কালের কুড়ুলে শেষমেষ।'

যখন পাড়ায় লাগে হঠাৎ আগুন ভয়াবহ,
আমার কবিতা নাকি ঘুমোয় তখনও অবিকল
গাছের গুঁড়ির মতো ভাবলেশহীন। আর ঘুম
ভাঙলেও আত্মমগ্ন বেহালায় দ্রুত টানে ছড়!

আমার কবিতা করে বসবাস বস্তি ও শ্মশানে,
চাঁড়ালের পাতে খায় সূর্যাস্তের রঙলাগা ভাত,
কখনো পাপিষ্ঠ কোনো মুমূর্ষু রোগীকে কাঁধে বয়ে
দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যায় আরোগ্যশালায়।

আমার কবিতা পথপ্রান্তে দুঃখীর চোখের মতো
চোখ মেলে চেয়ে থাকে কার পায়ের ছাপের দিকে,
গা ধোয় ঝরনার জলে। স্বপ্ন দ্যাখে, বনদেবী তার
ওষ্ঠে ঠোঁট রেখে হু হু জ্বলছেন সঙ্গম-লিপ্সায়।

বিপর্যস্ত গোলাপ বাগান

গোলাপ আমাকে দিয়েছে গোলাপ
বৃষ্টিসিক্ত তামস রাত্রিশেষে।
অথচ বিশ্ব বিষকালো আজ
হিংস্র ছোবলে, ভীষণ ব্যাপক দ্বেষে।

কাল রাত্তিরে যার পদরেখা
পড়েছে আমার নিঝুম স্বপ্নপথে,
সেকি সক্ষম প্রলেপ বুলোতে
স্মৃতিসংকুল আমার পুরানো ক্ষতে?

কাস্তের গুহায় আমি ইদানীং
শুনি মাঝে মাঝে টেলিফোনে যার গলা,
মধ্য বয়সে ম্লান গোধূলিতে
তাকে প্রিয়তমা কখনো যাবে কি বলা?

স্বয়চুম্বনে শিহরণ জাগে
অভিজ্ঞ হাড়ে, শিরায় জোনাকি জ্বলে
সভ্যতা দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু হয়
মানবতা ক্রমে চলেছে অস্তাচলে।

গণবিভ্রমে ভ্রষ্ট জনতা
নতজানু কত মেকি দেবতার কাছে।
ঘোর মরীচিকা, কাঁপে দশদিক
নাৎসী-প্রেতের বিকট ঘূর্ণি নাচে।

ধর্মপসারী বুড়ো শকুনের
পাখসাটে আজ ইরান বধ্যভূমি।
ডাগর বর্ষা ডাকে নিরালায়—
স্মৃতির প্রতিমা, এখন কোথায় তুমি?

বিপর্যস্ত গোলাপ বাগান,
ভঙ্গুর ডালে বুলবুল বীতগান।
ভুল লক্ষ্যের দিকে সংকেত
দেখায় দিশারী, ডেকে আনে পিছুটান।

তেহরানে নামে দুপুরে সন্ধ্যা,
যখন তখন ঘাতকের গুলি ছোটে;
হাফিজের আর সাদীর গোলাপ
কবি সুলতানপুরের হৃদয়ে ফোটে।

এবং নাজিম হিকমত পচে
কারাকুঠরিতে পুনরায় দিনরাত,
ফুচিক ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ায়,
তোলে গৌরবে মুষ্টিবদ্ধ হাত।

নেরুদা আবার শিউরে ওঠেন,
এখনই পঙ্গু ঈগল সাম্যবাদ ?
মাদ্রিদ আর চরাচর জুড়ে
লোরকা করেন কৃষ্ণ আর্তনাদ।

শিকারী কুকুর তাড়িত একাকী
রুশ কবি মৃত তুষার-ধবল ত্রাসে ;
নিরুদ্দিষ্ট তার ছায়া আজো
মৌন স্মৃতিতে বার বার ফিরে আসে

প্রতারিত চোখে দেখি অবিরাম
পথে-প্রান্তরে ছিন্ন মুণ্ড দোলে।
নিষ্ফল আমি, কী ফল ফলবে
অকালেই গাছ বজ্রদগ্ধ হ'লে ?

ঋতু না ফুরাতে গোলাপ ফুরায়,
মৃত্যু নিয়ত জীবনের প্রতিবেশী।
প্রেত-সৈকতে অদীন বেলায়
আসবে কি তুমি কান্তা মুক্তকেশী ?

আরাগঁ তোমার কাছে

আরাগঁ তোমার কাছে কোনোদিন পরিণামহীন
এই পংক্তিমালা
জানি না পৌঁছবে কিনা, তবু
তোমারই উদ্দেশে এই শব্দাবলী উড়ে যাক পেরিয়ে পাহাড়
অনেক পুরনো হ্রদ বনরাজি এবং প্রান্তর।
আমার এলসা আজ যৌবনের মধ্যদিনে একা
জীবনকে ফুলের একটি তোড়া ভেবে-টেবে আর
গানের গুঞ্জনে ভরে কোথায় আয়নার সামনে চুল আঁচড়ায়,
দীর্ঘ কালো চুল, পা দোলায় কোন্ সে চত্বরে ব'সে অপরাহ্নে

কিংবা পড়ে ম্লান মলাটের কবিতার বই কিংবা কোনো
পাখির বাসার দিকে চোখ রেখে কী যে ছাখে, ভাবে
আমি তা' জানি না, শুধু তার স্বপ্নের ফোঁটার মতো
গাঢ় ছুটি চোখ আর সুরাইয়ের গ্রীবার মতন
গ্রীবা মনে পড়ে ।

আরাগঁ আমার চোখে ইদানীং চালশে
এবং আমার নৌকো নোঙরবিহীন, তবু দেখি কম্পমান
একটি মাস্তল দূরে, কেমন সোনালি ।
অস্থিচর্মসার মাল্লা কবে ভুলে গেছে গান, কারো কারো
মাথায় অসুখ, ওরা বিড় বিড় ক'রে আওড়ায়
একটি অদ্ভুত ভাষা, মাঝে-মধ্যে দূর হ দূর হ ব'লে ঘুমের ভেতরে
কাদের তাড়ায় যেন, আমি শুধু দেখি
একটি মাস্তল দূরে, কেমন সোনালি ।
তরমুজ ক্ষেতের রৌদ্রে নগ্নপদ সে থাকে দাঁড়িয়ে—
আমার কবিতা ।
কখনো আমাকে ডেকে নিয়ে যায় বনবাদাড়ে যেখানে
সাপের সঙ্গম ছাখে স্তম্ভিত হুতোম প্যাঁচা, যেখানে অজস্র
স্বপ্নের রঙের মতো ঘোড়া খুরে খুরে ছিন্নভিন্ন করে ঘাসফুল
কখনো আমাকে ডাকে শহরতলির বর্ষাগাঢ় বাসস্টপে
কখনো বা সিনেমার জনময়তায়,
আমার স্তিমিত জন্মস্থানে
এবং আমার ঘরে খেলাচ্ছলে আঙুলে ঘোরায়
একটি রুপালি চাবি, বাদামি টেবিল ক্লথ খোঁটে
চকচকে নখ দিয়ে—আমার কবিতা ।
আবার কখনো তার সুপ্রাচীন তরবারির মতন বাহুদ্বয়
অত্যন্ত বিষণ্ণ মেঘ, তার ছুটি চোখ
ভয়ংকর অগ্নিদগ্ধ তৃণভূমি হয় ।
যে-বাড়ি আমার নয়, অথচ যেখানে আমি থাকি

তার দরোজায়
কে যেন লিখেছে নাম কৃষ্ণাক্ষরে—অসুস্থ ঈগল।

পাড়াপড়শীরা বলে, মাঝে-মধ্যে মধ্যরাতে জীর্ণ
বাড়িটার ছাদ আর প্রাচীন দেয়াল থেকে তীব্র ভেসে আসে
নিদ্রাছুট রোগা ঈগলের গান, কী বিষণ্ণ-গর্বিত গান।

আরাগঁ তোমার মতো আমিও একদা
শত্রুপরিবৃত শহরের হৃদয়ে স্পন্দিত হ'য়ে
লিখেছি কবিতা রুদ্ধশ্বাস ঘরে মৃত্যুর ছায়ায়
আর স্বাধীনতার রক্তাক্ত পথে দিয়েছি বিছিয়ে কত রক্তিম গোলাপ

আরাগঁ তোমার কাছে লিখেছি সে দেশ থেকে, যেখানে সূর্যের
চুম্বনে ফসল পাকে রাঙা হয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল,
সজীব মুখের ত্বক রুটির মতো ঝলসে যায়,
যেখানে বিশদ খরা, কখনোবা ভীষণ নির্দয় বানভাসি,
যেখানে শহুরে লোক, গ্রাম্যজন অনেকেই সাদাসিধে,
প্রায় বেচারাই, বলা যায়; আমাদের হালচাল
সাধারণ, চাল-চুলো অনেকের নেই।
আমাদের মাস ফুরোবার অনেক আগেই হাঁড়ি
মড়ার খুলির মতো ফাঁকা হ'য়ে যায়, দীর্ঘ দুরন্ত বর্ষায়
গর্তময় জুতো পায়ে পথ চলি, অনেকের জুতো নেই।
ধূর্তামি জানি না, মোটামুটি
সাদাসিধে লোকজন আশপাশে চরকি ঘোরে
এবং দু'মুঠো মোটা চালের ডালের জন্যে ক্ষুধার্ত আমরা
ক্ষুধার্ত সত্তার পূর্ণ সূর্যোদয়, ভালোবাসা নাম্নী লাল
গোলাপের জন্যে
আরাগঁ তোমার কাছে লিখছি সে দেশ থেকে আজ,
যেখানে দানেশমন্দ ব'সে থাকে অন্ধকার গৃহকোণে বুরবক সেজে
জরাগ্রস্ত মনে, অবসাদকবলিত কখনো তাড়ায় আস্তে
অস্তিত্বের পচা মাংসে উপবিষ্ট মাছি।

আরাগঁ তবুও জলে গ্রীষ্মে কি শীতে
আমাদের স্বপ্ন জলে খনি-শ্রমিকের বাতির মতন স্বপ্ন আমাদের।

ডেডেলাস

না, আমি বিলাপ করবো না তার জন্যে, যে আমার
নিজের একান্ত অংশ, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ; যাকে আমি
দেখেছি উঠোনে হাঁটি-হাঁটি পা-পা হেঁটে যেতে
আনন্দের মতো বহুবার। যখন প্রথম তার
মুখে ফুটেছিলো বুলি, কী যে আনন্দিত
হয়েছি সেদিন আমি; যখন জননী তার ওকে
বুকে নিয়ে চাঁদের কপালে চাঁদ আয় টিপ দিয়ে
যা ব'লে পাড়াতো ঘুম, আমি
স্বর্গসুখ পেয়েছি তখন।
কতদিন ওকে
নিজেই দিয়েছি গ'ড়ে পুতুল এবং
বসেছে সে আমার আপনকার পিঠে, ক্ষুদে অশ্বারোহী।
আমার স্নেহের ঘরে সে উঠেছে বেড়ে
ক্রমান্বয়ে,
আজ সে শুধুই স্মৃতি, বেদনার মতো বয়ে যায়
আমার শিরায়।

কোনো কোনো দিন স্থাপত্যের গূঢ় সূত্রবিষয়ক চিন্তার সময়
অকস্মাৎ দেখি সে দাঁড়িয়ে আছে আমার শয্যার পাশে
সুকান্ত তরুণ;
ইকারুস, ইকারুস ব'লে ডাকলেই উজ্জীবিত
দেবে সাড়া। কখনোবা মনে হয় আমার নিজের
হাতে গড়া ডানা নিয়ে দেবে সে উড়াল
দূর নীলিমায়
অসম্ভব উঁচুতে আবার।

না, আমি বিলাপ করবো না তার জন্যে, স্মৃতি যার
মোমের মতন গলে আমার সত্তায়, চেতনায়।

সর্বদা সতর্ক আমি, বিপদের গন্ধে সিদ্ধ, তাই
বুঝিয়েছিলাম তাকে সাবধানী হ'তে,
যেন সে না যায় উড়ে পেরিয়ে বিপদসীমা কখনো আকাশে।
কিন্তু সে তরুণ, চটপটে, ঝকঝকে, ব্যগ্র, অস্থির, উজ্জ্বল,
যখন মেললো পাখা আমার শিল্পের ভরসায়,
গেলো উড়ে ঊর্ধ্বে, আরো ঊর্ধ্বে, বহুদূরে,
সূর্যের অনেক কাছে প্রকৃত শিল্পীর মতো সব
বাধা, সতর্কতা
নিমেষে পেছনে ফেলে, আমি
শঙ্কিত অথচ মুগ্ধ রইলাম চেয়ে
তার দিকে, দেখলাম তাকে
পরিণাম বিষয়ে কেমন
উদাসীন, ক্রূর রৌদ্রঝলসিত, সাহসী, স্বাধীন।

না, আমি বিলাপ করবো না তার জন্যে, স্মৃতি যার
মোমের মতন গলে আমার সত্তায়, চেতনায়।

যেন আমি এখন উঠেছি জেগে অন্তহীন নির্জন সমুদ্রতীরে একা
আদিম বিস্ময় নিয়ে চোখে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে
নানা কথা, মনে পড়ে বাসগৃহ, বহুদূরে ফেলে-আসা কত
স্থাপত্যের কথা, আর নারীর প্রণয়। মনে পড়ে,
আমার সন্তান যেতো পাখির বাসার খোঁজে, কখনো কখনো
দেখতো উৎসুক চেয়ে আমার নিজের
বাটালি ছেনির চঞ্চলতা। মনে পড়ে
দেবতার মতো স্তব্ধ আলোচ্ছ্বাস, তরুণের ওড়া
ভয়ংকর অপরূপ দীপ্তিময়তায়। তার পতন নিশ্চিত
বলেই হয়তো আমি তাকে আরো বেশি ভালোবেসেছি তখন।

পিতা আমি, তাই সন্তানের আসন্ন বিলয় জেনে
শোকবিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ পাখির মতন দিশাহারা ;
শিল্পী আমি, তাই তরুণের সাহসের ভস্ম আজ
মৃত্যুঞ্জয় নান্দনিক সঞ্চয় আমার ।

মাতাল ঋত্বিক

যে-তুমি আমার স্বপ্ন

পুনরায় জাগরণ, গুল্মঢাকা আমার গুহার
আঁধারে প্রবিষ্ট হলো রশ্মিঝরনা, জাগালো কম্পন
এমন নিঃসাড় ম্রিয়মাণ সত্তাতটে। যে-চুম্বন
মৃতের পাণ্ডুর ওষ্ঠে আনে উষ্ণ শিহরণ, তার
স্পর্শ যেন পেলাম সহসা এতকাল পরে, আর
তৃণহীন বীতবীজ মৃত্তিকায় মদির বর্ষণ
দেখালো শস্যের স্বপ্ন। শিরায় শিরায় সঞ্চরণ
গোলাপের, নতুন মুদ্রার মতো খর পূর্ণিমার।

পাথুরে গুহার কাছে স্বপ্নজাত বনহংসী ওড়ে
অপ্সরার ভঙ্গীতে এবং তার পাখার ঝাপটে
মৃতপ্রায় সাপ নড়ে ওঠে ফের, মহাশ্চর্য দান
পেয়ে যায় কী সহজে, কারুকাজময় ত্বক ফোটে
শরীরে নতুন তার। তুমি এলে প্লাবনের পরে
যে-তুমি আমার স্বপ্ন, অন্নজল, অস্তিত্বের গান।

তোমাকে দিইনি আংটি

তোমাকে দিইনি আংটি, বাগদত্তা ছিলে না আমার
কোনোকালে, গোধূলিতে তুমি লাজরক্তিম যেদিন
বসবে উৎসব হয়ে বিবাহমণ্ডপে, সঙ্গীহীন
থাকবো বিনিদ্র ঘরে চুপচাপ, যেমন খামার
পুড়ে গেলে নিঃস্ব চাষী ব'সে থাকে হা-হা শূন্যতায়।
ছিলো না আমার অধিকার কোনোদিন পুষ্পকুল
উদ্যানে তোমার, শুধু স্বপ্নের ভিতরে কিছু ফুল
তুলেছি বাগান থেকে মাতাল আঙুলে, বলা যায়।

যখন রঙিন পথে হেঁটে যাবে তুমি যৌবনের
সৌরভ ছড়িয়ে, পদস্পর্শে হবে চূর্ণ ছন্নছাড়া

কবির নিটোল স্বপ্ন ; ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত লেবাস
পড়বে তোমার চোখে। দাঁতে-ছেঁড়া সে-বেশ বরের
নয় ; ছিলো যার, তাকে পশুপাল করে তাড়া
রাত্রিদিন, সঙ্গী তার কংকাল-কর্কশ সর্বনাশ।

দ্বিতীয় যৌবন

তোমার যোগ্য কি আমি ? এখন আমার দিকে চোখ
রেখে ভালো ক'রে ছ্যাখো খুটিয়ে খুটিয়ে ছ্যাখো এই
আমাকে নবীনা তুমি। আমার সত্তায় আর নেই
প্রখর বৈভব, প্রৌঢ়ত্বের তাম্রছায়া প্রায় শোক
হ'য়ে ঝুলে থাকে ত্বকে ; আমি সেই জুয়াড়ী যে তার
সর্বস্ব খুইয়ে বসে আছে একা। অথচ এখন
সহস্র নক্ষত্র-জ্বলা অনাবিল তোমার যৌবন।
তোমার সত্তায় স্পষ্টাঙ্কিত রহস্যের অন্তঃসার।

আমার কিছুই নেই, না প্রতাপ, না বৈভব। শুধু
এই আধপেটা জীবনের ছকে বেয়াড়া সন্ত্রাসে
অপটু অভিনেতার মতো আওড়াই কী যে ভুল
শব্দাবলি এলোমেলো, কিছুইতো নয় অনুকূল —
তবুও তোমার স্পর্শে জেগে ওঠে আমার এ ধুধু
জীবনে দ্বীপের মতো দ্বিতীয় যৌবন জয়োল্লাসে।

জয়নুলী কাক

কখন মিটিঙ ভেঙে গ্যাছে, মিটে গ্যাছে বেচা-কেনা
সকল দোকান-পাটে, ফলের বাজার শূন্য ; ঘরে
ফিরি দীর্ঘ পথ হেঁটে একা একা, বুকের ভেতরে
কী একটা কষ্টবোধ, ভিড়ে কাউকে যায় না চেনা।

পাঁশুটে জ্যোৎস্নায় দেখি মৃতের মিছিল। তাকাবে না
ফিরে ওরা, মনে হয়, কস্মিনকালেও ; চরাচরে
আর কোনো টান নেই জেনেই বুঝিবা এ শহরে
নির্বিকার হেঁটে চলে, দেবে না চুকিয়ে কোনো দেনা।

পাঁশুটে জ্যোৎস্নায় অকস্মাৎ ডানা-ঝাপটানি, ডাক
শোনা যায় ; এক, দুই, তিন, সংখ্যাহীন পক্ষী এসে
ছাদের কার্নিশে, ফুটপাতে আর রিক্ত রেস্তোরাঁয়
বসে ; ওরা তৃষাতুর, মানুষের মগজের নিভৃত প্রদেশে
প্রবেশ করতে চায়। যেন ওরা জয়নুলী কাক,
বিংশ শতাব্দীর কবিতার মতো গূঢ় ডেকে যায়।

পিঁপড়ের দ্বীপে

নৈশ ভোজনের পর মার্কিন টাইম ম্যাগাজিন
উল্টেপাল্টে তুলে নিই ডিফোর রবিনসন ক্রুশো,
কিছুক্ষণ ঘুরি তার সঙ্গে ; কী অদ্ভুত বেশভূষা
নিজের শরীরে দেখি, ছাগগন্ধ এই ঘুমহীন
রাত্রি ভরপুর, অকস্মাৎ পিঁপড়ের ঝাঁক ধেয়ে
আসে চতুর্দিক থেকে। অতিকায় ওরা, টেলিফোন
তার, খাট, দেয়ালের মাঠে, যেন অত্যন্ত গোপন
ষড়যন্ত্রে বুঁদ হয়ে, উঠছে চেয়ার বেয়ে বেয়ে।

পিঁপড়েগুলি চকচকে লাল গ্রেনেডের মতো,
যে-কোনো মুহূর্তে ওরা ভীষণ পড়বে ফেটে, ঘর
নিমেষে কাঠের গুঁড়ো হবে, জলপাই রঙ জীপে
চেপে এসে আমার হদিস কেউ পাবে না, আহত
আমি রইবো ঢাকা ভগ্নস্তূপে, দুঃস্বপ্নের এ প্রহর
এত দীর্ঘ কেন ? কেন বন্দী আমি পিঁপড়ের দ্বীপে ?

বাজপাখি

ক্রূর ঝড় থেমে গ্যাছে, এখন আকাশ বড়ো নীল—
গাছের সবুজ পাতা কেঁপে কেঁপে অত্যন্ত সুষম
বিন্যাসে আবার স্থির। খরগোশের চঞ্চল উদ্যম
আশপাশে, বাজপাখি উঁচু চূড়া থেকে অনাবিল
আনন্দে তাকায় চতুর্দিকে, কোনো নিষ্ঠুর দুঃশীল
চিন্তা নেই আপাতত, বিস্তর বয়স, চোখে কম
ছাখে, নখ উদ্যমরহিত, বুকে গোপন জখম,
তবুও ডরায় তাকে নিম্নচারী পাখির মিছিল।

পাহাড়ে পড়েছে তার ছায়া কতদিন, মাঝে মাঝে
এখনো সে করে যাত্রা মেঘলোকে, যখন হাঁপায়
অন্তরালে গুটিয়ে ঘর্মাক্ত ক্লান্ত ডানা, চোখ বুজে—
দুঃস্বপ্ন দখল করে তাকে, শোকাবহ সুর বাজে
বুকের ভেতরে, কিন্তু নিমেষেহ চৈত্র পূর্ণিমায়
চোখ তার ভাবময়, ডাকে তাকে কে যেন গম্বুজে।

সেই সুর

এখনো আমার মন আদিম ভোরের কুয়াশায়
প্রায়শ আচ্ছন্ন হয়। মনে হয়, স্বচ্ছন্দ কৌশলে
আমার শহরটিকে প্রাচীন দেবতা করতলে
সর্বদা আছেন ধ'রে ; পশু-পাখি কেমন ভাষায়
কথা বলে, খৃষ্টপূর্বে শতাব্দীর নারী কী আশায়
ব'সে থাকে নদীতীরে। ছিন্ন শির, বীণা খরজলে
সুরময় ভাসমান, সেই সুরে গাছের বাকলে,
পিঙ্গল সিংহের চোখে, শিলাখণ্ডে স্বপ্ন ঝরে যায়।

সে-সুরের ক্ষীণ ছায়া, মনে হয়, আজো মাঝে মাঝে
আমার নিমগ্ন অবচেতনের প্রচ্ছন্ন প্রদোষে
খেলা করে, নইলে কেন অস্তিত্বের তন্ত্রীতে আমার
জাগে সূক্ষ্ম কম্পন এমন ? মর্মমূলে কেন বাজে
সহসা অদৃশ্য বীণা ? খরস্রোতে চোখ রেখে ব'সে
আছি একা ঔদাস্যের তটে, নেই লোভ অমরার ।

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ
(আবদুর রাজ্জাক খান বন্ধুবরেষু)

শেষ-হ'য়ে-আসা অক্টোবরে
শীতের দুপুরে নিউ ইয়র্কের অরচার্ড স্ট্রীটে ঘুরে ঘুরে
একটি দোকান দেখি মায়াপুরী, দোকানি ওয়াল্ট ডিজ্‌নির
আশ্চর্য ডবল, বলা যায়। দিলেন পরিয়ে গায়ে
স্মিত হেসে সহজ নৈপুণ্যে নীল একটি ব্লেজার। ব্লেজারের
বুকে জাগে অরণ্যের গহন শ্যামলপ্রস্থ, সরোবর-উদ্ভূত অমর্ত্য
দূরায়নী তান।

সুনীল ব্লেজার ঝুলে আছে
আলনায়, কাঠের হ্যাংগারে একা আমার পুরানো ম্লান ঘরে
মালার্মের কবিতার স্তবকের মতো নিরিবিলি,
অথচ সংগীতময় সর্বক্ষণ অস্তিত্বের পরতে পরতে।
নানান সামগ্রী ঘরে থরে থরে, কিছু এলোমেলো ; সামগ্রীর ভিড়ে
সুনীল ব্লেজার যেন বহু গদ্য-লেখকের মাঝে
বড় একা একজন কবি।

ব্লেজারের দিকে চোখ যায়
যখন তখন, দেখি সে আছে নিভৃত অহংকারে,
থাকার আনন্দে আছে, নিজের মতন
আছে ; বলে সান্দ্র স্বরে, 'এই যে এখানে আছি, এই
থাকা জানি নিজের তাৎপর্যময় খুব।' এ মুহূর্তে
যদি ছুঁই তাকে, তবে মর্মরিত হবে সে এখন, উঠবে জেগে
স্বপ্ন-সুদূরতা থেকে।

কখনো ব্লেজার কৌতূহলে
দ্রুত জেনে নিতে চায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীকে কখনো
তীব্র চুমো খেয়েছেন কিনা জোড়াসাঁকোর ডাগর অভিজাত
পূর্ণিমায়,

নব্য কবিসংঘ কী পুরাণ নিয়ত নির্মাণ করে মেধার কিরণে আর
শীতার্ত পোল্যাণ্ড আজ ধর্মঘটে রুদ্ধ কিনা কিংবা কোন্
জলাভূমিতে গর্জায়
গেরিলার স্টেনগান, হৃদয়ের মগ্নশিলা, আর্ত চাঁদ
ইত্যাদিও জানা চাই তার।

ভোরবেলা ঘন
কুয়াশার তাঁবুতে আচ্ছন্ন চোখ কিছুটা আটকে গেলে তার
মনে হয় যেন সে উঠেছে জেগে সুদূর বিদেশে
যেখানে এখন কেউ কারো চেনা নয়, কেউ কারো
ভাষা ব্যবহার আদৌ বোঝে না, দেখে সে
উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ বিরানায় ; মুক্তিযুদ্ধ,
হায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়।

কোথায় পাগলাঘণ্টি বাজে
ক্রমাগত, এলোমেলো পদধ্বনি সবখানে। হামলাকারীরা
ট্রাম্পেট বাজিয়ে ঘোরে শহরে ও গ্রামে
এবং ক্রন্দনরত পুলিশের গলায় শুকায় বেল ফুল।
দশদিকে কত একাডেমীতে নিশীথে
গোর-খোদকেরা গর্ত খোঁড়ে অবিরত, মানুষের মুখগুলি
অতি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে শিম্পাঞ্জীর মুখ।

গালিবের জোব্বা,
দিল্লীর সূর্যাস্ত যেন, রবীন্দ্রনাথের আলখাল্লা অনুপম,
মৌলানা রুমির খিরকা, বোদলেয়ারের মখমলী
কালো কোট দুলে ওঠে আমার সুনীল ব্লেজারের কাছাকাছি।
কিছু অসন্তোষ গাঁথা সুতোয়, বিশদ কারুকাজে ;
ইতিহাসবিদ্বেষী ব্লেজার পুণ্য নীল পদ্ম অকস্মাৎ,
অবাধ স্বাতন্ত্র্য চায় ব্যাপক নির্মুখতায় আজ।

নষ্ট হ'য়ে যাবে
ভেবে মাঝে মাঝে আঁৎকে ওঠে, টুপির মতন ফাঁকা
ভবিষ্যৎ কল্পনায় মূর্ত হয় কখনো কখনো,
কবরের অবরুদ্ধ গুহা তাকে চেটেপুটে খাবে
কোনোদিন, ভাবে সে এবং নীল পাখি হ'য়ে দূর
সিমেট্রির মিশকালো সাইপ্রেস ছেড়ে পলাশের রক্তাভায়
ব'সে গান গায়।

প্রকৃত প্রস্তাবে

ভালোই আছি আজ, জ্বরের নেই তাপ ;
সময় ভালো বটে শীতের কিছু পরে।
হঠাৎ চেয়ে দেখি এসেছে কোত্থেকে
চড়ুই পাখি দুটি এসেছে এই ঘরে।

এ ঘরে বসবাস আমার বহুকাল।
স্মৃতির মেঘমালা বেড়ায় ভেসে মনে :
কেটেছে কতদিন নানান বই প'ড়ে,
কখনো গান শুনে, কখনো চুম্বনে।

এ ঘরে কত রাত ভালেরি এসেছেন,
কখনো কালিদাস, বোদলেয়ার, রুমি।
পেরিয়ে স্বপ্নের সুনীল সেতু আর
টানেল কুহকের কখনো আসো তুমি।

এখানে এই ঘরে সকালে মাঝরাতে
টেবিলে ঝুঁকে লিখি ; হারিয়ে ফেলি পথ
কখনো শব্দের গহীন জঙ্গলে।
কখনো পাই কত পংক্তি মৃগবৎ।

চড়ুই নীড় বেঁধে এখানে এই ঘরে
রাখতে চায় তার প্রেমের স্বাক্ষর ।
অথচ জানে না সে বিপুল চরাচরে
প্রকৃত প্রস্তাবে আমারই নেই ঘর ।

রঞ্জিতাকে মনে রেখে

রঞ্জিতা তোমার নাম, এতকাল পরেও কেমন
নির্ভুল মসৃণ মনে পড়ে যায় বেলা অবেলায় ।
রঞ্জিতা তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো কোনো এক
গ্রীষ্মের দুপুরে দীপ্র কবি সম্মেলনে
কলকাতায় ন বছর আগে, মনে পড়ে ?

সহজ সৌন্দর্যে তুমি এসে বসলে আমার পাশে ।
কবি প্রসিদ্ধির
অমেয় ভাণ্ডার থেকে রত্নরাজি নিয়ে
আজ আর সাজাবোনা তোমাকে রঞ্জিতা । শুধু বলি,
তোমার চোখের মতো অমন সুন্দর চোখ কখনো দেখিনি ।
'বিচ্ছিরি গরম'
ব'লেই সুনীল খাতা দুলিয়ে আমাকে তুমি হাওয়া
দিতে শুরু করেছিলে, সেই হাওয়া একরাশ নক্ষত্রের মতো
মমতা ছড়িয়ে দ্যায় । যদি আমি রামেন্দ্রসুন্দর
ত্রিবেদী হতাম, তবে বলতাম হে মেয়ে 'ইহাই বাঙালিত্ব' ।

কিছুই বলেনি একালের কবি, শুধু মুগ্ধাবেশে
দেখেছে তোমার মধ্যে তন্বী গাছ, পালতোলা নৌকো,
পদ্মময় দীঘি আর শহরের নিবিড় উৎসব ।
রঞ্জিতা সান্নিধ্য বড় বেশি মোহময় চিত্রকল্প তৈরি করে,
দেখায় স্বপ্নের গ্রীবা— বুঝি তাই আমিও ভেবেছি,
ক'দিনের সান্নিধ্যের সুরা পান করে,

একান্ত আমারই দিকে বয়েছিলো তোমার গোলাপি হৃদয়ের
মদির নিশ্বাস আর সে বিশ্বাসে আমরা দু'জন
অপরাহ্ণে পাশাপাশি হেঁটে গেছি কলেজ স্ট্রীটের
অলৌকিক ভিড়ে, ফুটপাতে ফুটেছিলো মল্লিকা, টগর, জুঁই
তোমার হৃদয়ে উন্মীলিত
আমারই কবিতা আর চোখের পাতায় শতকের অন্তরাগ।
রঞ্জিতা আবার কবে দেখা হবে আমাদের কোন
বিকেল বেলার কনে-দেখা আলোর মায়ায় কোন
সে কবিসভায় কিংবা ফুটপাতে?
রঞ্জিতা তোমাকে আমি ডেকেছি ব্যাকুল বারংবার
ডেকেছি আমার
নিজস্ব বিবরে। এই চরাচরব্যাপী অসম্ভব হট্টরোলে
অসহায় আমার এ কণ্ঠস্বর কি যাবে না ডুবে?
কী করে আমরা ফের হবো মুখোমুখি
বিচ্ছিন্নতাবোধের পাতালে?
ছদ্মবেশী নানাদেশী ঘাতকের খড়্গের ছায়ায়
কী করে আমরা চুমো খাবো?
কী করে হাঁটবো আণবিক আবর্জনাময় পথে?
ভীষণ গোলকধাঁধা রাজনীতি, আমরা হারিয়ে ফেলি পথ
বার বার, পড়ি খানাখন্দে, মতবাদের সাঁড়াশি
হঠাৎ উপড়ে ফেলে আমাদের প্রত্যেকের একেকটি চোখ। সে ভূখণ্ডে
রঞ্জিতা তোমার আদিবাস, তার মাৎস্যন্যায় দু'চোখের বিষ
এবং আমার মধ্যে নেই কোনো বশংবদ ছায়া।

হয়তো কখনো আর কলকাতায় যাবো না এবং
তুমিও ঢাকায় আসবে না। তাহলে কোথায় বলো
দেখা হবে আমাদের পুনরায় অচেনা পথের কোন মোড়ে?
মস্কো কি পিকিং-এ নয়, ওয়াশিংটনেও নয়, ব্যাঙ্কক জাকার্তা
জেদ্দা কি ইস্তামবুল, হামবুর্গ, কোনোখানে নয়
আমরা দু'জন

হয়তো মিলিত হবো নামগোত্রহীন
উজ্জ্বল রাজধানীতে কোনো, যাকে ডাকবো আমরা
মানবতা বলে,
যেমন আনন্দে নবজাতককে ডাকে তার জনক-জননী।

কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি

টানেলে একাকী

একটি টানেলে
কাটিয়ে দিলাম হিমযুগ এবং প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ,
লৌহযুগ খুব একা একা,
কাছাকাছি কেউ নেই এবং দূরেও ঘন কুয়াশায় কারো
অস্তিত্ব ফোটে না, শুধু ব্যর্থ যৌবনের মতো একটি কুকুর আজো
সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

কতকাল আমি সূর্যোদয়
দেখিনি, শুনিনি কোনো দোয়েলের শিস। কালেভদ্রে
যেন কোনো বাজিকর টানেলের দেয়ালে ফোটায়
আলোর গোলাপ, ঝিল্লীস্বর শুনে টের পাই রাত।
যদিও প্রায়শ শ্বাসকষ্ট হয়, তবু নিশ্বাস নেবার মতো
অবশ্য থেকেই যায় কিছু অক্সিজেন।

টানেলের ভেতরে হঠাৎ
কখনো চিৎকার শুনে আতঙ্কে শরীর শজারুর
কাঁটা হয় আর চোখ ফেটে যায় আনারের মতো। চতুর্দিকে
দৃষ্টি ছোটে, ঘুরি দুটি হাত প্রসারিত করে, অথচ আমার
নিজস্ব অস্পষ্ট ছায়া ছাড়া কাউকে পাই না খুঁজে
কোথাও এখন।

কখনো কখনো
মনে হয়, কী যেন কিসের ঘোরে চলে গেছি সুদূর কোথাও
স্বপ্নচর পাখির পাখায় ভর করে, কাছে আসে
বাহাদুর শাহ জাফরের গজলের মতো এক
বিরান বাগান আর মোগল মিনিয়েচার কিছু অস্তরাগে কান্নারুদ্ধ
রক্তাভ চোখের মতো পুরাণসম্ভব।

অপরাহ্নে ডিভানে শায়িতা
মহিলা আমাকে ডেকে পিকাসোর ত্রিমুখী রমণী হয়ে যান
চোখের পলকে, আমি তার স্তনদ্বয়, অভিজাত নাভিমূল,
রমণীয়, উল্লসিত যোনি থেকে দূরে, ক্রমশ অনেক দূরে
চলে যেতে থাকি ; তিনি কবিতার পংক্তির মতন
কেবলি ওঠেন বেজে অস্তিত্বে আমার।

এ কোথায় এসে
দাঁড়ালাম অবশেষে ?   তবে কি প্রকৃত রবটের
কাল শুরু হলো আজ ?   সকলেই রবট তাহলে ইদানীং ?
কান্তিমান, লাইনো টাইপগুলি করেছে নির্মাণ
অদ্ভুত জগৎ এক ; রাশি রাশি টাইপ কি দ্রুত
বেলা-অবেলায়

অবলীলাক্রমে
মিথ্যাকে বানায় সত্য, সত্যকে ডাগর মিথ্যা আর
রমণ, বমন, বিস্ফোরণ যূথবদ্ধ আত্মহনন ইত্যাদি
শব্দাবলি দশদিকে সহজে রটিয়ে দেয় এবং সাজায়
সুচারু যান্ত্রিকভাবে কবিতার পংক্তিমালা মিল-
অমিলের উদ্ভট নকশায়।

অসম্ভবে হয়েছি সওয়ার
আকৈশোর ; অতিকায়, মৎস্যপৃষ্ঠে করেছি ভ্রমণ
সমুদ্দুরে বহুকাল, জলপরীদের দিব্যলালিম স্তনাগ্র ছুঁয়ে-ছেনে
গেছে বেলা পাতালের জলজপ্রাসাদ আর খসিয়ে নিজের
বুকের পাঁজর থেকে হাড় বানিয়েছি দেবতারও
ঈর্ষণীয় বাঁশি।

অথচ উচ্চাভিলাষহীন
গৌরবের হেমবর্ণ চূড়া থেকে বহুদূরে আছি,
দেখি কয়লার গুঁড়ো, স্বপ্নবৎ ঊর্ণাজাল, কীটপতঙ্গের

ঘর-গেরস্থালি, দেখি জানু বেয়ে ওঠে নীল পোকা, মাঝে মাঝে
বাদুড়ের ডানা কাঁপে, সিল্কের রুমাল যেন ; থাকি দীর্ঘ কালো
টানেলে একাকী ।

কেউ কি পালিয়ে যায়

কেউ কি পালিয়ে যায় অকস্মাৎ নিজের বাড়ির
দোরগোড়া থেকে কোনোদিন ?   নিজের একান্ত প্রিয়
বই, যাবতীয়
খুঁটিনাটি বস্তুময় ঘরটাকে খুব ফাঁকা করে
কেউ কি স্বেচ্ছায় সাততাড়াতাড়ি চলে যায় নিজস্ব হাঁড়ির
ভাপ-ওঠা ভাত ফেলে ?   ঘোরে
এলোমেলো গন্তব্যবিহীন
অন্ধকারে মুখ ঢেকে ভয়ে ভয়ে থাকে রাত্রিদিন ?

মাঝে মাঝে এরকম হয়, হতে থাকে—
গেরস্থ সাজানো ঘবদোর ছেড়ে নিমেষে পালায় ঊর্ধ্বশ্বাসে
সেখানে, যেখানে রক্তখেকো বাঘ ডাকে,
পড়ে গণ্ডারের, বন্যবরাহের পদচ্ছাপ,
বিষধর সাপ
ফণা তোলে, দোলে হিস্‌হিসে তাজা ঘাসে ।

'বলো তো এমন কেন হবে' বলে কেউ
ছাগলের চামড়ার মতো স্তব্ধ আকাশের দিকে
চেয়ে কিছুক্ষণ হাসে ফিকে
হাসি, আড়চোখে দেখে আশপাশে কত ফেউ
এর ওর তার ছায়া চেটে খায় ।   যেহেতু হঠাৎ
এপাড়া ওপাড়া
সব পাড়াতেই চলে প্রেতের পাহারা,
অকৃত্রিম সুহৃদের মুখের আদল

নিয়ে প্রত্যেকেই দ্রুত হয়ে ওঠে নির্দয় কিরাত।
বিশ্ব-চরাচরে রাসায়নিক বাদল
ব্যেপে আসে দেখি ক্রমান্বয়ে
খুব ঘন হয়ে।

নিজস্ব বিবর ছেড়ে যাই না কোথাও
দূরে স্বপ্ন সঞ্চরণে, দোরগোড়া থেকে
কখনো হঠাৎ সরে গেলে অভিমানে মুখ ঢেকে,
'ঘুমন্ত রাজার ঘরে দাও
হানা মধ্যরাতে' বলে দেয় প্ররোচনা চতুর্থ ডাকিনী
তাকে দেখে মুখ আমি কখনো ঢাকিনি।
তবু আর্তবিবেকের নিঃসঙ্গ জোনাকি জ্বলে আর
নেভে, নেভে আর জ্বলে
আজো অবচেতনের গহীন জঙ্গলে।
ভয়ার্ত পাখির মতো ইদানীং কাঁপছে সময়,
হোক না যতই অন্ধকার
ঘর, সেখানেই ফিরে আসি, আসতেই হয়।

কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি

যখন আমি সাত-আট বছরের বালক,
তখন আমার মেজাভায়ের হাতে
প্রথম দেখেছিলাম
রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা। আমাদের বাড়ির চিলেকোঠায়
কাটতো আমার অগ্রজের সিংহভাগ সময়।
অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল তাঁর,
যদিও মঞ্চে পাঠ মুখস্থ বলেননি কোনো দিন।
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
নানা ধরনের মুখভঙ্গি করার অভ্যাস ছিল তাঁর।

কখনো ভুরু জোড়া কুঁচকে যেত খুব,
কখনো আবার চোখ হয়ে উঠতো
শোকাহত বাল্মীকির চোখের মতো। মাঝে মাঝে তিনি
চয়নিকা থেকে আবৃত্তি করতেন
পাকা অভিনেতার মতো হাত-পা নেড়ে,
দিব্যি গলা খেলিয়ে। যখন দরাজগলায়
অগ্রজ উচ্চারণ করতেন, হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে'
তখন কেন জানি না
আমি নিজেকে দেখতে পেতাম খুব উঁচুতে
কোন পর্বতচূড়ায়। আর যখন 'মহামানবের সাগরতীরে'
বলে তিনি তাকাতেন জানালার বাইরে,
তখন তাঁকে এক মুগ্ধ বালকের চোখে লাগতো
যাত্রাদলের সুদর্শন রাজার মতো। সবকিছু ছাপিয়ে
মহামানবের সাগরতীরে— এই শব্দগুচ্ছ
আমার সত্তায় জলরাশির মতো গড়িয়ে পড়তো বারংবার।
চয়নিকার সঙ্গে আমার পরিচয় হবার আগেই
হলদে মলাটের সেই বইটি
কোথায় হারিয়ে গেলো, তারপর
কখনো চোখে পড়েনি আর।
এখনো যখন আমি ফিরে যাই মাঝে-মধ্যে
ছেলেবেলার চিলেকোঠায়, তখন বিকেলের রঙের মতো
চয়নিকা কেমন অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

চয়নিকার সঙ্গে যখন আমার চক্ষু মিলন হয়েছিলো,
তখন রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে
শুধু একটি নাম। সে নামের আড়ালে কী মহান বিস্ময়
দীপ্যমান, তা' জানার জন্যে আমাকে পাড়ি দিতে হয়েছে
দীর্ঘপথ। আমার নিজস্ব রবীন্দ্রনাথকে
আমি আবিষ্কার করেছি ক্রমান্বয়ে
অভিযানের দুর্বার নেশায়।

চয়নিকার কাল থেকেই কি শুরু
কবিতার সঙ্গে আমার গেরস্থালি? নাকি
বাঁশ বাগানের মাথার উপর যে-শাশ্বত চন্দ্রোদয়
আমি লক্ষ্য করেছিলাম, সেদিন থেকে?
হতে পারে অনেক অনেক বছর আগে
আমার নানী ভোরবেলা আঙিনায় বসে
যে-মুহূর্তে গৃহপালিত মোরগের ঝুঁটি
পরখ করতে করতে আমাকে বলেছিলেন, 'এটা ওর তাজ'
সেই মুহূর্তেই কবিতা ঊষা হয়ে জড়িয়ে ধরেছিলো আমাকে,
কিংবা এও তো সম্ভব,
দীর্ঘকাল আগে আমার নানা যে-স্বপ্নের
কথা বলেছিলেন, যে-স্বপ্নে তিনি বহু আলিশান হাবেলি
মিস্‌মার হতে দেখেছিলেন,
সেই স্বপ্নই আমাকে কবিতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলো,
অথবা হতে পারে বাল্যকালে কোনো এক মধ্যরাতে
বৃষ্টির শব্দ শুনে আমি জেগে উঠেছিলাম
যখন, ঠিক তখনই কবিতা আমাকে নিয়ে গেলো
বিরামবিহীন শ্রাবণধারায়।

আমাদের চিলেকোঠা থেকে চয়নিকা লুপ্ত হবার পর
আমার অগ্রজ আর কখনো গলা খেলিয়ে
কবিতা আবৃত্তি করেছেন কিনা, মনে পড়ে না।
তাঁর আবৃত্তি আর না শুনলেও,
সেই, যে মহামানবের সাগরতীরের ধ্বনি
তিনি মিশিয়ে দিয়েছিলেন আমার অন্তর্লীন প্রবাহে
তা' আমাকে ছেড়ে যায়নি কখনো।
চল্লিশের দশকের গোধূলিতে কবিতার সঙ্গে, বলা যায়,
আমার ঘনিষ্ঠ জীবনযাপন হলো শুরু।
তখনই সঞ্চয়িতা উপহার হয়ে
এসেছিলো আমার হাতে। কিছুকাল আমি

মগ্ন হয়েছিলাম তাতে, যেমন কোনো দরবেশ
সমাধিস্থ হন অনন্ত কি অসীমের প্রেমে।
কিন্তু কী যে হলো, পঞ্চাশের দশকে প্রত্যুষ
আমাকে ছুঁতেই, সেই ঘোর গেলো কেটে—
তিরিশের কবিসংঘ দিলেন প্রবল ডাক, পোড়ো জমি থেকে
হাতছানি দিলেন এলিয়ট, কান পাতলাম
এলুয়ার এবং আরাগঁর যুগলবন্দীতে আর নিমেষে
তারুণ্যের তেজে হঠকারী অবহেলায়
সঞ্চয়িতাকে ধুলোয় মলিন হতে দিয়ে
স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে গেলাম
ভিন্ন স্বাতন্ত্র্যের আকুল সন্ধানে। বুঝি তাই
তখন আমাকে লিখতে হলো—
'মধ্যপথে কেড়েছেন মন,
রবীন্দ্র ঠাকুর নন, সম্মিলিত তিরিশের কবি।'

কিন্তু, সরে গেলেই কি যাওয়া যায়?
বয়স যতই বাড়ছে, ততই আমি সেই সমুদ্রের দিকে
যাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ যার নাম, যেমন যাচ্ছি
দান্তের বিপুল বিশ্বে, যেন ভীষণ রুক্ষ
নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন করছি নিজ বাসভূমে।

জানি না আমার অগ্রজ-উচ্চারিত
মহামানবের সাগরতীরে সেই সুদূরে
কবিতার সঙ্গে প্রথম আমার জীবনযাপন
শুরু হয়েছিলো কিনা,
তবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কোনো গৌরীর
মুখ মনে-পড়ার-মতন
একদা আমাদের চিলেকোঠায় হারিয়ে যাওয়া
হলদে মলাটের চয়নিকাকে আজো মনে পড়ে, মনে পড়ে, মনে পড়ে।

নিজস্ব উঠোনে

টেবিলে ছিলেন ঝুঁকে কিছুক্ষণ আগে, এখন চেয়ার'ছেড়ে
পুরাণের পুরানো ট্যাপেস্ট্রি ছেড়ে আলোছায়াময়
নিজস্ব উঠোনে তিনি পায়চারি করছেন অত্যন্ত তন্ময়।
অকস্মাৎ হাঁস দুটি জব্দ পাখা ঝেড়ে
উঠলো ভয়ার্ত ডেকে। কখন যে সুনামগঞ্জের ক্ষেতে পাকা
ধান-খেতে-আসা চকলেট-রঙ হাঁসের বাচ্চাটা
(নতুন পালক তার এ শহরে হয়েছিলো ছাঁটা)
হলো ক্ষিপ্রগতি নেউলের সহজ শিকার লতাগুল্ম ঢাকা

কিঞ্চিৎ দুর্গম কোণে, তিনি কিছুই পাননি টের
বিকেল বেলায়, পরে পাখিপ্রিয় কনিষ্ঠ কন্যার জবানিতে
জানা গেলো খুঁটিনাটি সকল বৃত্তান্ত। আত্মজার দুচোখ পানিতে
ছিলো খুব টলটলে। আকস্মিক এই হিংস্র ঘটনার জের
টেনে মনে তিনি ফের অন্য মনে উঠোনে হাঁটেন
নিরিবিলি থেকে-থেকে কখনো কাশেন।

কনিষ্ঠ কন্যার পোষা ময়নাটা দাঁড়ে ব'সে থাকে
বারান্দায়, ছোলা খায়, কখনো-বা তার
'শেবা, শেবা' ডাকে
বাড়ির স্তব্ধতা জব্দ হয় খুব এবং গোলাপ গাছটার
পাতা শিহরণে শব্দহীন গীত যেন মাঝে-মাঝে।
বসন্তের সাঁঝে
বাতি জ্বলে ওঠে ঘরে। প্রৌঢ় কবি তখনও উঠোনে;
ধাবমান যানপিষ্ট কুকুরের মতো
স্বীয় যাবতীয় অতীতের কথা ভেবে-ভেবে তিনি গৃহকোণে
আবার আসেন ফিরে অভ্যাসবশত।
অনন্তর অসমাপ্ত কবিতার চিত্রকল্প যমক অথবা
অক্ষরবৃত্তের স্বর ভাবেন। উঠোনে হাস্যময়ী রক্তজবা।

নায়কের ছায়া

ম্যানিলা, শোনো

ম্যানিলা, শোনো, কোনোরকম ভণিতা বিনাই বলি—
বারবনিতার খদ্দের-জোটানো চটকিলা
হাসির মতো তোমার জ্যোৎস্না
কোনো কোনোদিন অবিরত জ্বালা ধরায়
আমার স্মৃতিতে। ভোর গড়ায় দুপুরে, বিকেল রাত্রিতে।
দিনের পর দিন যায়, দিন যায়। মাঝে-মধ্যে কে যেন
অন্তর্গত কী একটা উস্‌কে দ্যায়;
কখনো কখনো যায় এমন দিনও,
যখন শুধু রক্তে আমার বাজে ফিলিপিনো, ফিলিপিনো!

ম্যানিলা, মনে পড়ে, ঝলমলে সকালে কফিশপে
খাচ্ছিলাম ব্রেকফাস্ট, টলটলে সোনালি
চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে
দেখছিলাম তাকে, মানে আইরিন নাম্নী তরুণীকে।
কাউণ্টারে দাঁড়ানো সে। তার মুখে দক্ষিণপূর্ব এশীয় মাধুর্য,
সূর্য এবং মেঘসমন্বিত মায়া। কী সুন্দর তুমি,
তোমার মুখ থেকে চোখ ফেরানো যায় না,
বলেছিলাম তাকে। সহজ মাদকতাময় দৃষ্টি হেনে
ঠোঁটে ছড়িয়ে দিলো সে
পুষ্প বিকাশের আভা; মনে পড়ে, তার কমনীয় গ্রীবা, স্বপ্নিল
চিবুক আর রমণীয় বুক।
মনে পড়ে, তার কোমর ছিল ক্ষীণ,
আজো রক্তে আমার বাজে ফিলিপিনো, ফিলিপিনো!

ম্যানিলা, আমার আপন শহরের পথে রাত্তিরে
হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি তোমার কথা
এই অস্পষ্ট ভিড়ে ভেসে যেতে-যেতে। ভাবছি, তুমি
কতদিন মার্কিন সৈনিকের কোলে বসে, হে নগ্নিকা,
ফষ্টিনষ্টি করেছো, তোমার ক্ষুধার্ত শিশুদের পাশে শুইয়ে রেখে

ভিনদেশী বণিকের যৌনসঙ্গিনী হয়ে
নিজেকে ক্লান্ত করেছো কত মৌন রাতে। তোমার উরু
আর স্তন নিয়ত নিষ্পিষ্ট হাজার হাজার বিদেশী হাতে।
না, ম্যানিলা, তুমি অমন তাকিও না আমার দিকে,
রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি। বিশ্বাস করো,
লোকে তোমাকে ছেনাল অথবা বেশ্যা বললে
আমার মন ভারি খারাপ হয়ে যায়। তখন নিরালায়
তোমার স্মৃতির বীয়ার পান করতে করতে
পদ্য লিখে মনোভার হাওয়ায় লঘু মিলিয়ে দিতে চাই।
ম্যানিলা, আকণ্ঠ কাদায় ডুবেও তুমি রঙিন ও
জলজলে আর রক্তে আমার বাজে ফিলিপিনো, ফিলিপিনো।

ম্যানিলা, তোমার যন্ত্রণা ও কান্নার কথা ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে
বলেছিলেন দীর্ঘকায় অধ্যাপক আরমান্দো মালয়, বলেছিলেন
সলিদারিদাদ বইঘরে পেঙ্গুইন পকেটবুক
দেখার ফাঁকে ফাঁকে। শোকার্ত তাঁর বাক্যের সেতুর ওপর
আমি একটি মৌন মিছিল দেখলাম, দেখতে পেলাম
এমন কিছু মানুষ, যারা বালিতে তৈরি যেন, যারা
বাঙ্‌ময় হতে চায়,
অথচ ওদের কণ্ঠনালী কেমন পাথুরে হয়ে গ্যাছে, সেখানে
উচ্চারণের কোনো ডানাঝাপটানি নেই।
হঠাৎ চমকে উঠে শুনি রিজালের মূর্তি আর স্মৃতিসৌধের তৃণ
হাওয়ায় ইতিহাসের রেণু উড়িয়ে বলে ফিলিপিনো, ফিলিপিনো।

বেড়ালের জন্য কিছু পঙ্‌ক্তি

একটি বেড়াল ছিল ক'বছর আমার বাসায়
কুড়িয়ে আদর, বিশেষত আমার কনিষ্ঠা কন্যা
ওর প্রতি ছিল বেশি মনোযোগী, নিয়মিত ওকে
দেখাশোনা করা, ওর প্রতীক্ষায় থাকা প্রতিদিন,

নাওয়ানো, খাওয়ানো, ওর জন্যে নিজের ভাগের মাছ
তুলে রাখা ছিল তার নিত্যকার কাজ। একদিন
বলা-কওয়া নেই, সে বেড়াল কোথায় উধাও হলো,
কিছুতে গেল না জানা, খোঁজাখুঁজি হলো সার আর
আমার কনিষ্ঠা কন্যা ভীষণ খারাপ করে মন
খেল না দুদিন কিছু চুপচাপ নিলো সে বিছানা,
উপরন্তু বলেনি আমার সঙ্গে কথা অভিমানে,
যেন বেড়ালের এই অন্তর্ধান আমারই কসুর।

কী করে বোঝাই তাকে? 'আচ্ছা এবার তাহলে আসি
আবার কখনো হবে দেখা' বলে দিব্যি কোনো কোনো
মানুষও তো এভাবেই চলে যায় বিপুল শূন্যতা
দিয়ে উপহার, তার সঙ্গে দেখা হয় না কখনো।

সায়োনারা

দূর ওসাকায় সন্ধ্যাবেলায়
প্লাটফর্মের আনাচে কানাচে তাড়া;
কেউ বলে এলে এতদিন পরে,
কেউ বা ব্যাকুল সায়োনারা, সায়োনারা।

তোমাকে সেখানে দেখবো ভাবিনি,
দেখেই শিরায় জাগলো বিপুল সাড়া।
প্রথম দেখার নিমেষেই হাওয়া
বলে কানে কানে সায়োনারা, সায়োনারা।

ট্যাক্সিতে রাতে তুমি আর আমি,
নেচে উঠেছিল তোমার চোখের তারা।
ওসাকা-রাতের দৃশ্যাবলীতে
লেখা ছিল বুঝি সায়োনারা, সায়োনারা।

সুন্দরীতমা দৈবদয়ায়
এসেছিলে কাছে, হৃদয় আত্মহারা।
চোখের পলকে সময় ফুরায়,
রটে চরাচরে— সায়োনারা, সায়োনারা।

ওসাকার সেই শহর-মরুতে
বস্তুত তুমি মরুদ্যানের চারা,
আমার তামাটে সত্তা তোমার
ছায়ায় শুনেছে সায়োনারা, সায়োনারা।

আমরা দু'জন করেছি ভ্রমণ ;
তুমি হিরোশিমা ; তুমিই কিয়োতো ; নারা ;
পায়ের তলায় হলদে পাতারা
করে ফিস্‌ফিস্— সায়োনারা, সায়োনারা।

মন্দিরে দেখি বুদ্ধ মূর্তি,
শিল্পিত হাতে বইছে পুণ্যধারা,
তোমার ও-হাতে হাত রাখতেই
পাখি গেয়ে ওঠে সায়োনারা, সায়োনারা।

কথায় কথায় বলেছিলে তুমি
কখনো দু'পাতা মিশিমা পড়েনি যারা,
তারা জানবেনা জাপানী নারীকে ;
তোমার দু'চোখে করি পাঠ সায়োনারা।

শেষ রাত্রির কেটেছে আলাপে,
শরীর তোমার যেন স্বপ্নের পাড়া।
লিফ্‌ট-এ নামার কালে, মনে পড়ে,
বলেছিলে তুমি সায়োনারা, সায়োনারা।

তোমার স্বদেশে প্রবাসী ছিলাম,
ছিলাম উদাস, কিছুটা ছন্নছাড়া।
হৃদয়ে আমার পরবাস আজ,
প্রাণে বাজে শুধু সায়োনারা, সায়োনারা।

এক ফোটা কেমন অনল

এই মাতোয়ালা রাইত

হালায় আজকা নেশা করছি বহুত। রাইতের
লগে দোস্তি আমার পুরানা, কান্দুপট্টির খানকি
মাগীর চক্ষুর কাজলের টান এই মাতোয়ালা
রাইতের তামাম গতরে। পাও দুইটা কেমুন
আলগা আলগা লাগে, গাঢ়া আবরের সুনসান
আন্দরমহলে হাঁটে। মগর জমিনে বান্ধা পাও।

আবে, কোন্ মাম্‌দির পো সামনে খাড়ায়? যা কিনার,
দেহস্ না হপায় রাস্তায় আমি নামছি, দৌড় দে;
না অইলে হোগায় লাথ্‌থি খাবি, খাবি চটকানা গালে
গতরের বিটায় চেরাগ জলতাছে বেশুমার।

আমারে হগলে কয় মইফার পোলা, জুম্মনের
বাপ, হুস্না বানুর খসম, কয় সুবরাতি মিস্ত্রি।
বেহায়া গলির চাম্পা চুমাচাট্টী দিয়া কয়, 'তুমি
ব্যাপারী মনের মানু আমার, দিলেব হকদার।'

আসলে কেউগা আমি? কোন্‌হানতে আইছি হালায়
দাগাবাজ দুনিয়ায়? কৈবা যামু আখেরে ওস্তাদ?
চুড়িহাট্টা, চান খাঁর পুল, চকবাজার; আশক
জমাদার লেইন; বংশাল; যেহানেই মকানের
ঠিকানা থাউক, আমি হেই একই মানু, গোলগাল
মাথায় বাবরি; থুতনিতে ফুদ্দি দাড়ি, গালে দাগ,
যেমুন আধলি একখান খুব দূর জামানার।

আমার হাতের তালু জবর বেগানা লাগে আর
আমার কইলিজাখান, মনে অয়, আরেক মানুর
গতরের বিতরে ফাল পাড়ে, একটুকু চৈন নাই
মনে, দিল জিঞ্জিরার জংলা, বিরানি দালান। জানে
হায়বৎ জহরিলা কেঁকড়ার মতন হাঁটা-ফিরা

করে আর আইতে এমুনবি অয় নিজেরেও বড়
ডর লাগে, মনে অয় যেমুন আমিবি জমিনের
তলা থন উইঠা আইছি বহুত জমানা বাদ।

এ কার মৈয়ত যায় আন্ধার রাইতে? কোন্ ব্যাটা
বিবি-বাচ্চা ফালাইয়া বেহুদা চিত্তর অইয়া আছে
একলা কাঠের খাটে বেফিকির, নোওয়াব যেমুন।
বুঝছোনি হউরের পো, এলা আজরাইল আইলে
আমিবি হান্দামু হেষে আন্ধার কব্বরে। তয় মিয়া,
আমার জেবের বিতরের লোটের মতই হাচা মৌত।

এহনবি জিন্দা আছি, এহননি এই নাকে আহে
গোলাব ফুলের বাস, মাঠার মতন চান্নি দিলে
নিরালা ঝিলিক মারে। খোওয়াবের খুব খোবসুরৎ
মাইয়া, গহীন সমুন্দর, হুন্দর পিনিস আর
আসমানী হুরীর বাবাত; খিড়কির রৈদ, ঝুম
কাওয়ালীর তান, পৈখ সুনসান বানায় ইয়াদ।
এহনবি জিন্দা আছি, মৌতের হোগায় লাথ্থি দিয়া
মৌত তক সহি সালামত জিন্দা থাকবার চাই।

তামাম দালান কোঠা, রাস্তার কিনার, মজিদের
মিনার, কলের মুখ, বোগানা মৈয়ত, ফজরের
পৈখের আওয়াজ আন্ধা ফকিরের লাঠির জিকির—
হগলই খোওয়াব লাগে আর এই বান্দাবি খোওয়াব?

পান্থজন

বহু পথ হেঁটে ওরা পাঁচজন গোধূলিতে
এসে বসে প্রবীণ বৃক্ষের নিচে ক্লান্তি মুছে নিতে।
গাছের একটি পাখি শুধায় ওদের—
'বলতো তোমরা কারা?' প্রশ্ন শুনে পান্থজন

ঝুঁকে পড়ে নিজের বোধের
কাছে ; বলে একজন "হিন্দুত্বের প্রতি আজন্ম আমার টান।"
দ্বিতীয় জনের কণ্ঠ বাঁশির মতন
বাজে, 'আমি বৌদ্ধ, হীনযান।'
এবং তৃতীয় জন বলে, 'আমি এক নিষ্ঠাবান
বিনীত খ্রীষ্টান,
চতুর্থ পথিক করে উচ্চারণ, আমার ঈমান
করেছি অর্পণ আমি খোদার আরশে,
আমিতো মুসলমান।'

পঞ্চম পথিক খুব কৌতূহলবশে
কুড়িয়ে পতঙ্গ এক বলে স্মিত স্বরে, 'আমি মানবসন্তান।'

মৌনব্রত

আমার উদারচেতা পিতামহ, যাঁকে আমি কখনো দেখিনি,
শুনেছি সর্বদা তিনি থাকতেন অত্যন্ত নিশ্চুপ,
এমন কি তাঁর অঙ্কশায়িনী ছিলেন যিনি, তিনি
কোনোকালে তাঁকে অপরূপ
অন্তরঙ্গ প্রহরে প্রগল্‌ভ হতে দেখেছেন, এমন প্রমাণ
রাখেননি আমাদের পরিবারে সে সিংহপুরুষ। পুত্র তার,
আমার জনক, মাঝে মাঝে মুখ খুললেও, জোটেনি সম্মান
কোনো বাক্যবাগীশের কোনোদিন। আর
আমি সেই কবে থেকে জিভের জড়তা
নিয়ে আছি অসহায়, অত্যন্ত বিব্রত
বাকপটুদের ভিড়ে। এবং আমার পুত্র কথা
বলতেই শিখলো না, তার কী ভীষণ মৌনব্রত।

আমার কোনো তাড়া নেই

বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো

জো, তুমি আমাকে চিনবে না। আমি তোমারই মতো
একজন কালো মানুষ গলার সবচেয়ে
উঁচু পর্দায় গাইছি সেতুবন্ধের গান, যে-গানে
তোমার দিলখোলা সুরও লাগছে।

জো, যখন ওরা তোমার চামড়ায় জ্বালা-ধরানো
সপাং সপাং চাবুক মারে আর
হো হো ক'রে হেসে ওঠে,
তখন কালসিটে পড়ে সভ্যতার পিঠে।
যখন ওরা বুটজুতোমোড়া পায়ে লাথি মারে তোমাকে,
তখন ধুলায় মুখ থুবড়ে পড়ে মানবতা।
জো, যখন ওরা তোমাকে
হাত-পা বেঁধে নির্জন রাস্তায় গার্বেজ ক্যানের পাশে
ফেলে রাখে, তখন ক্ষ্যাপাটে অন্ধকারে
ভবিষ্যৎ কাতরাতে থাকে
গা' ঝাড়া দিয়ে ওঠার জন্যে।

যদিও আমি তোমাকে কখনো দেখিনি জো,
তবু বাইবেলের কালো অক্ষরের মতো তোমার দু'ফোঁটা চোখ
তোমার বেদনার্ত মুখ বারংবার
ভেসে ওঠে আমার হৃদয়ে, তোমার বেদনা
এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় ব্যাপ্ত, জো।

আমি একজন ফাঁসির আসামীকে জানতাম,
যিনি মধ্যরাতে আবৃত্তি করতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা।
আমি এক সুদর্শন যুবাকে জানতাম,
যে দয়িতার মান রাখার জন্যে জান কবুল করেছিলো
আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে,

আমি একজন যাবজ্জীবনই কারাবন্দী তেজী
নেতাকে জানতাম, দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে
যিনি কোনো কোনো রাতে তার শিশুকন্যাকে একটু
স্পর্শ করার জন্যে, ওর মাথার ঘ্রাণ নেয়ার জন্যে উদ্বেল আর
ব্যাকুল হয়ে আঁকড়ে ধরতেন
কারাগারের শিক।

আমি এমন এক তরুণের কথা জানতাম,৷
যে তার কবিতায় আলালের ঘরের দুলাল, মেনিমুখো শব্দাবলি ঝেড়ে
ফেলে
অপেক্ষা করতো সেদিনের জন্যে,
যেদিন তার কবিতা হবে মৌলানা ভাসানী
এবং শেখ মুজিবের সূর্যমুখী ভাষণের মতো।

যখন তাদের কথা মনে পড়ে,
তখন তোমার কথা নতুন ক'রে ভাবি, জো।
জো, যখন তোমার পাঁচ বছরের ছেলেব
বুক থেকে রাস্তায় ওরা ঝরায় টকটকে লাল রক্ত,
যেমন পিরিচে ঢেলে' ছায় কফি
জো, তখন তোমার পোয়াতি বউ হায়নাদের
দৃষ্টি থেকে পালানোর জন্যে দৌড়ুতে দৌড়ুতে
মাঝপথে হুমড়ি খেয়ে পড়ে,
জো, যখন তোমার সহোদরকে ওরা
লটকিয়ে ছায় ফাঁসিতে,
তখন কাচা দুধের ফেনার মতো ভোরের শাদা আলোয়
বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো আর্তনাদ করতে করতে
হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

রুটিন

তাঁকে চেনে না এমন কেউ নেই এ শহরে
তিনি থাকেন
সবচেয়ে অভিজাত এলাকায় হাঁটেন মোজেইক করা মেঝেতে
বসেন ময়ূর সিংহাসনসুলভ গদিমোড়া চেয়ারে
খ্যাতি তাঁর পায়ের কাছে কুকুরের মত
কুঁই কুঁই শব্দে লেজ নাচায়
হলফ করে বলতে পারি আমাদের আগামী
বংশধররা বাধ্যতামূলকভাবে পড়বে তাঁর সচিত্র জীবনী
স্কুল কলেজে সমাজ রাষ্ট্র জগৎসংসার বিষয়ক তাঁর হ্যাণ্ডবুক
সুকান্ত লাইনো টাইপে
প্রকাশিত হবে বছরের পর বছর
আর এও তো অবধারিত যে তাঁর জন্মবার্ষিকী এবং
মৃত্যুবার্ষিকীতে আপামর জনসাধারণ
ভোগ করবেন সরকারী ছুটি

আমাদের এই পঙ্গু দেশ যাতে তিন লাফে এলাহি
পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারে
সেজন্যে রাত জেগে তিনি লেখেন বন্যায় ভেসে যাওয়া
ছাগলের পেটের মত ঢোসকা নিবন্ধ
ফজরে দশ মিনিট নামাজ পড়ার পর তিনি
পনেরো মিনিট তেলাওয়াত করেন কোরান পাক
খুরপি আর ঝারি হাতে
আধঘন্টা বাগান করেন
দুর্লভ জাতের গোলাপ ফোটানোই তার লক্ষ্য
এক ঘণ্টা কাটে তাঁর
ব্রেকফাস্ট করে খবরের কাগজ পড়ে
আর ডেটারজেন্ট সুবাসিত সাফসুতরো বাথরুমে
তিনি দশটা পাঁচটা অফিস করেন নিয়মিত

ক্লাবের টেনিসকোর্টে কাটান ঘণ্টা দেড়েক
ছেলেমেয়েদের আদর করেন পনেরো মিনিট
ঘড়ি ধরে ঘরের বউকে সোহাগ করেন ত্রিশ মিনিট
পরের বউকে নব্বই মিনিট
মাশাল্লা মজবুত তাঁর শরীরের গাঁথুনি
ইস্পাতী গড়ন অথচ
মাখনের মত নরম তাঁর মন
প্রত্যহ তিনি গরিবগুর্বোদের জন্যে দুঃখ করেন
পাক্কা তিন মিনিট

শ্লোগান

হৃদয়ে আমার সাগর দোলার ছন্দ চাই
অশুভের সাথে আপোসবিহীন দ্বন্দ্ব চাই।
এখনো জীবনে মোহন মহান স্বপ্ন চাই
দয়িতাকে ভালোবাসার মতোন লগ্ন চাই।
কবিতায় আমি তারার মতোন শব্দ চাই,
শান্তি এবং কল্যাণময় অব্দ চাই।
মল্লিকা আর শেফালির সাথে চুক্তি চাই,
সর্বপ্রকার কারাগার থেকে মুক্তি চাই।
মুক্তি চাই,
মুক্তি চাই।

কবিতার প্রতি ঢ্যামনা

এখন নখরাবাজি ছাড়। লচ্ খাওয়া হয়ে গেছে
অনেক আগেই ; সেই কবে থেকে জোমে আছি আর
তোমার জন্যেই আজ আমি এমন উঠাইগিরা।
তোমার অশোক ফুল ফোটা পড়েছে আমার চোখে

বহুবার, বহুবার দেখেছি ঝুল্‌পি, ছাতি। জিভ
ভ্যাঙচানো ; বুলিয়েছি হাত ঝাপে। জোড়-খাওয়া তা-ও
হয়েছে অনেকবার হে চামর খেপ্‌লু আমার।
আমিতো কপাল ফেরে ভিড়েছি তোমার মারকাটারি

অন্দরখানায়। আচমকা থেমে পড়ি, ফের গোড়া
থেকে করি শুরু আর এক পা এক পা চলি ; তুমি
কাছে না থাকলে বলো কী ক'রে হাওয়ায় গেরো বাঁধি ?
কেন তুমি মাঝে মধ্যে খামোকো বাতেলা দিতে চাও
আন্‌সান্‌ কথা রাখ চনমনে মেয়ে যদি তুমি
আমার এ খোমা-বিলা দেখে সবকিছু গুবলিট
করে দিতে চাও, তবে কেন নিয়েছো আমার ছল্‌লা
ঘন-ঘন কান্‌কি মেরে ? চুসকি তুমি, সাতঘাটে ঘুরে

ফিরে বেড়ানোই কাজ ; স্থিতু হয়ে বসতে পারো না
কোথাও সামান্যক্ষণ। এখন হঠাৎ ঠাণ্ডা পানি
হবে তুমি, তা হবে না। কেননা হেকোরবাজ নই
আমি আজো, যদিও ঢ্যাম্‌না বলা যায় ইদানীং।

যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে

চতুর্থ ভাষা

আমরা দু'জন
বৌদ্ধ বিহারের কাছে হল্‌দে পাতাময় পথে দাঁড়িয়ে ছিলাম
কিছুক্ষণ।
হৃদয় আবৃত্তি করে বারে বারে ভিনদেশী নাম
তোমার এবং মৃদু কথোপকথনে
আগ্রহী আমরা বলি কিছু ঝাপসা, গুঁড়ি গুঁড়ি কথা।
জানি না এখানে আজ এসেছি কিসের অন্বেষণে
নিজস্ব অস্তিত্বে নিয়ে গূঢ় ব্যাকুলতা।

যে-ভাষায় স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর গীতাঞ্জলি,
যোগাযোগ, গোরা, নষ্ট নীড়
আমি সে-ভাষায় কথা বলি।
যে-ভাষা সহজে তোলে মীড়
আজন্ম তোমার প্রাণে, সে-ভাষায় ঋদ্ধ কাওয়াবাতা
তুষারে ফুটিয়েছেন কত ফুল। অথচ আমরা কেউ কারো
ভাষায় বলিনি কথা অজ্ঞতাবশত। ঝরা পাতা
গান হয় পায়ের তলায় আর তৃতীয় ভাষায় কিছু গাঢ়
কথা বলি পরস্পর, আধো-বাধো, মানে
ইয়েটস-এর ভাষা তোমার আমার ঠোঁটে
গুঞ্জরিত হয়, দুটি প্রাণে
বাড়ে মূক ব্যাকুলতা, যেন মন্দিরের গায়ে বয় হাওয়া, ফোটে
সহসা চতুর্থ ভাষা যুগল সত্তায়.
সে-ভাষা চোখের আর স্পর্শাভিলাষী হাতের। তুমি
আর আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাষাময় ভাষাহীনতায়
তন্ময় সাঁতার কাটি, খুঁজি যুগ্মতার জন্মভূমি।

ভাবীকথকের প্রতি

তুমি তো এসেই গ্যাছো। তোমাকে দেখেছি শহরের
সবচেয়ে দীন চাখানায়,
বাস টার্মিনালে, দগ্ধ ঘাসময় মাঠের কিনারে
একা লোকচক্ষুর আড়ালে,
প্রধান সড়কে আর গোধূলিতে পার্কের বেঞ্চিতে,
সন্ধ্যায় ওভারব্রিজে, কখনো চড়কে,
কখনো বা মহররমী শোকার্ত মিছিলে;
দেখেছি ঝিলের ধারে, জন্মান্ধ ডোবার আশেপাশে।

তোমার পরনে নেই জেল্লাদার পোশাক-আশাক,
যা দেখে ঝলসে যাবে চোখ; কতলোক
আসে যায় সর্বদা তোমার পাশ ঘেঁষে। মনে হয়,
করে না তোমাকে লক্ষ কেউ। বেলাশেষে ক্ষীণ আলোয় ফিরতি
মানুষের ঢেউ দোলে, উদাসীন তুমি
তাকাও নিস্পৃহ চোখে চাদ্দিকে এবং স্মিত হেসে
আওড়াও মনে মনে, কোথায় কে শিশু চোখ খোলে,
কোথায় নিমেষে কার চোখ বুজে যায়,
দিন যায়, দিন যায়;
নও তুমি দীর্ঘকায় খর্বকায়ও নও। ভিড়ে মিশে গেলে তুমি
সহজে সনাক্ত করা দায়। অথচ কোথায় যেন
কী একটা আছে, বোঝা যায় চোখ পড়লেই,
তোমার ভেতরে।
তোমার দুচোখ নয় যেমন তেমন। চক্ষুদ্বয়ে
করুণার জ্যোতি খুঁজি; যারা দিব্যোন্মাদ, বুঝি তারা
এমন চোখেরই অধিকারী।

কী বলবে তুমি এই হৈ হুল্লোড়ে? শুনছে না কাড়া
নাকাড়া বাজছে অবিরাম দশদিকে?
নরনারী উচ্ছল সবাই,

যেন পানপাত্র থেকে ভরা মাইফেলে
উপচে পড়ছে ফেনা অবিরত। কিন্তু প্রত্যেকেই
অস্তিত্বে বেড়াচ্ছে বয়ে ঘুণপোকা ; ভব্যতাসম্মত
আচরণে ওরা নড়ে চড়ে ক্ষণে ক্ষণে
পুতুলনাচের মতো। কখনো অভিন্ন ছাঁচে হাসে,
কাঁদে সিনেমার সীটে বসে, ভিটেমাটি আগলায়,
মেতে থাকে শত বছরের আয়োজনে,
গলায় তাবিজ তাগা প'রে
কাটায় জীবন।

যখন বলবে তুমি গাঢ় কণ্ঠস্বরে
'অকস্মাৎ দীর্ণ হবে নিথর মৃত্তিকা,
প্রবল ফুৎকারে ধ্বসে যাবে লক্ষ লক্ষ অট্টালিকা,
কংকাল জীবিতদের কবরে শুইয়ে দেবে খুব
তাড়াহুড়ো ক'রে'
যখন বলবে তুমি
অসংখ্য কবর থেকে মৃতদের উত্থানের কথা,
তেজস্ক্রিয় ভস্মে সমাহিত সব নগরীর কথা,
মানবজাতির দ্রুত পতনের কথা,
রক্ত-হিম-করা
সর্বশেষ সংঘর্ষের কথা,
বেজন্মা, বেনিয়া সভ্যতার নিশ্চিহ্ন হবার কথা ;
তখন সে উচ্চারণ কেউ কেউ শুনবে দাঁড়িয়ে
রুটিমাখনের দোকানের ভিড়ে, কেউ
আনকোরা দামি শাড়ি পরখ করার কালে আর
কেউবা আইস্ক্রীম খেতে খেতে, কেউ সিনেমার
টিকিট কেনার কালে,
কেউবা গণিকালয়ে ঢোকার সময়।

তোমার কম্পিত উচ্চারণে
বস্তুত নগরবাসী দেবে না আমল।

আবছা মনস্কতায় শুনবে, যেমন
শোনে ক্যানভাসারের গৎ-বাঁধা কথা।
যদি দিতে চাও তুমি সত্যতার বিশুদ্ধ প্রমাণ,
তবে সুনিশ্চিত
তোমাকে যেতেই হবে দাউ দাউ
আগুনের মধ্য দিয়ে আর
অলৌকিক নগ্ন পায়ে হেঁটে সাবলীল
পাড়ি দিতে হবে খরনদী।

শহীদ মিনারে কবিতাপাঠ

আমরা ক'জন
শহীদ মিনারের পাদপীঠে এসে দাঁড়ালাম
ফেব্রুয়ারির শীতবিকেলে। একে একে
আস্তে সুস্থে সেখানে আসতে শুরু করলো অনেকে,
যেমন তীর্থভূমিতে অবিরাম
জড়ো হন ভক্তগণ।

সেখানে রোদের ঝলক ছিল না, আকাশ
তখন রাশভারি দার্শনিকের মুখের মতো,
আশেপাশে উজ্জ্বলতার কোনো আভাস
চোখে পড়েনি, তবু অবিরত
কিছু জ্যোতির্বলয় মনে হলো, খেলা
করছিলো। আমরা ক'জন সেই বিকেলবেলা
চুপচাপ আরো ঘনিষ্ঠ হলাম পরস্পর।

একটু পরে আমাদের কণ্ঠস্বর
হলো মঞ্জরিত। আমাদের উচ্চারণের স্তবক
নিলো ঠাঁই শহীদ মিনারে সমর্পিত ফুলের পাশে।

সে সব শব্দগুচ্ছ ছিল না নিছক
শব্দ শব্দ খেলা, ছিল তারও বেশি, বিশ্বাসে
সঞ্জীবিত, নিশ্বাসে নিশ্বাসে অলৌকিক
ছন্দোময়। হঠাৎ পড়লো মনে সদ্য-প্রয়াত কবিবন্ধুর মুখ;
তার কথা ভেবে আমার চোখ করে চিক চিক
পানিতে, যেন মরীচিকা। উন্মুখ
চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ, সরে বসে তড়িঘড়ি
আমার পাশে জায়গা করি,
যদি সে আবার আসে। তার বদলে দেবদূতের গান
ভেসে আসে দশদিক থেকে, থর থর
কাঁপি পাতার মতো; মুহ্যমান
শহুরে গাছপালা, পথ, সিঁড়ি, প্রধান চত্বর।

আমাদের কবিতাপাঠের সময়
মনে হয়
তাঁরা এলেন শহীদ মিনারে, নিঃশব্দে কিছুক্ষণ
আসা-যাওয়া করে চত্বরে ক'জন
শহীদ দাঁড়ান পাদপীঠে। নিমেষে শস্যক্ষেত হয়ে যায়
শহীদ মিনার, তাঁরা কাহাতশাসিত দেশের শস্যের মতো
দুলতে থাকেন ক্রমাগত।
তারপর তাঁরা সব কিছু ছাপিয়ে ওঠেন, এমন দীর্ঘকায়।

দশ টাকার নোট এবং শৈশব

যা যায় তা' আর ফিরে আসে না কখনো
ঠিক আগেকার মতো। পাখির ডানার
শব্দে সচকিত
সকালবেলার মতো আমার শৈশব
প্রত্যাবর্তনের দিকে ফেরাবে না মুখ
কস্মিনকালেও।

বাঁকদেওয়া মোরগের ধনুকের ছিলার মতন
গ্রীবা, চৌবাচ্চায় একজোড়া সীমাবদ্ধ
হাঁসের সাঁতার, ভোরবেলাকার শিউলির ঘ্রাণ,
গ্রীষ্মের বিকেলে স্নিগ্ধ কুলপি বরফ,
মেরুন রঙের খাতাময় জলছবি,
সন্ধ্যার গলির মোড়ে কাঁধে মইবওয়া বাতিঅলা,
হানি সাহেবের হলদে পুরোনো দালান,
খড়বিচালির গন্ধভরা মশা-গুঞ্জরিত
বিমর্ষ ঘোড়ার আস্তাবল, মেরাসীনদের গান
ধরে আছে সময়ের সুদূর তরঙ্গে মেশা আমার শৈশব।

মনে পড়ে, যখন ছিলাম ছোট, ঈদে
সদ্যকেনা জামাজুতো প'রে
সালাম করার পর আম্মার প্রসন্ন হাত থেকে
স্বপ্নের ফলের মতো একটি আধুলি কিম্বা সিকি
ঝরে যেত ঝলমলে ঝনৎকারে আমার উন্মুখ
আনন্দিত হাতে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সেই পাট চুকে গেছে কবে।
এখন নিজেই আমি ছোটদের দিই ঈদী বর্ষীয়াণ হাতে,
আয়নায় তাকিয়ে দেখি আপনকার কাঁচাপাকা চুল,
ত্বকের কুঞ্চন।

এই ঈদে জননীকে করলাম সালাম যখন,
অনেক বছর পরে আম্মা কী খেয়ালে অকস্মাৎ
দিলেন আমার হাতে দশ টাকার একটি নোট,
স্বপ্নেদেখা পাখির পালক যেন, আর
তক্ষুনি এল সে ফিরে অমল শৈশব
আমার বিস্মিত চোখে কুয়াশা ছড়িয়ে।

জন্মভূমিকেই

শহরে রোজ ট্রাফিক গর্জায়,
চতুর্দিকে চলছে কী হুজুগ :
কত চৈত্র, কত শ্রাবণ যায়,
তোমাকে আমি দেখি না কত যুগ।

অথচ দেখি নিমেষে আজকাল,
একলা ঘরে যখনই চোখ বুজি।
খাটিয়ে রাঙা কল্পনার পাল
তোমার কাছে গিয়েছি সোজাসুজি।

তোমাকে দেখি তালদীঘির ঘাটে,
শারদ ভোরে দূর বেদাগ নীলে ;
তোমাকে দেখি ফসলছাওয়া মাঠে,
চিলেকোঠায়, দূর চলনবিলে।

তোমার চোখ, তোমার কেশভার
ঝলসে ওঠে আমার চোখে শুধু।
কে আশাবরী শোনায় বারবার,
হৃদয়ে জ্বলে স্মৃতির মরু ধু ধু।

বৃথাই আমি তোমাকে কাছে চাই
অত্যাচারী দিন, স্বৈরাচারী রাত
আমাকে রোজ পুড়িয়ে করে ছাই --
পাই না আর তোমার সাক্ষাৎ।

তোমার কাছে শিখেছিলাম বটে
বাঁচার মানে নতুন ক'রে মেয়ে।
এখন শুনি নানান কথা রটে,
সত্য গেছে মিথ্যাতেই ছেয়ে।

রটনা জানি নেহাৎ একপেশে,
স্বপ্নেও যে তোমার দেখা নেই।
কিন্তু মেয়ে তোমাকে ভালোবেসে
হৃদয়ে চাই জন্মভূমিকেই।

চড়ুইভাতির পাখি

দপ্তরে ব'সে গুমোট দুপুরে হঠাৎ পড়ল মনে
একদা আমরা ক'জন নিভৃতে কাটিয়েছিলাম চড়ুইভাতির দিন
শালনার শালবনে।

শীত দুপুরের স্বচ্ছ রোদের আদর শরীরে মেখে
কাটিয়েছি বটে আহারে বিহারে ; একটি কি দু'টি পাখি
চকিতে গিয়েছে ডেকে।
কেউ বলেছিল কবরী কেমন খোঁপা বাঁধে সিনেমায়,
কেউবা ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজাল উষা উথুপ, রুনা লায়লার গান,
কেউ পপ সুরে লেকের কিনারে চমকিলা নেচে যায়।

কেউ সচিত্র পত্রিকা খুলে অলস দৃষ্টি মেলে
দেখে নটীময় ফুরফুরে পাতা, পড়ে উড়ো কথা কিছু ;
কেউ বুক থেকে তার জামদানী শাড়ির আঁচল হেসে
ফেলে দেয় অবহেলে।

নকৃশি ছায়ায় কাঠবিড়ালিটা বিকেলের মায়া নিয়ে
তরতর ক'রে গাছ বেয়ে ওঠে, দেখি।
মাথার ওপর খেলিয়ে সবুজ ঢেউ উড়ে যায় কত যে সতেজ টিয়ে।
আমি তার মুখ ভেবে আর কবিতার
বিন্যাস খুঁজে ছিলাম একাকী ঘাসে কান পেতে ফলের মতন শুয়ে।
অলকানন্দা বয়ে যায় পাশে, হৃদয়ে আমার লায়ারের ঝংকার।

এখানে কোথায় হরিণের লাফ, বাঘের জোয়ালো ডাক ?
নিসর্গ খুব শান্ত এখানে, কিন্তু হঠাৎ ভীষণ চমকে শুনি
গুলির শব্দ, দিশাহারা দেখি বনের পাখির ঝাঁক।
আমাদেরই কেউ টিপেছে ট্রিগার, একটি আহত পাখি
নিরীহ সবুজ ঘাস লাল ক'রে অদূরে লুটিয়ে পড়ে।
ছটফট-করা পাখিটার দিকে সভয়ে তাকিয়ে থাকি।
পাখিটার কাছে ছুটে যায় শিশু শিকারী দিলেন শিস।
শালবনে গাঢ় ছায়া নেমে আসে, এখন ফেরার পালা।
ছায়ার ভেতর বেজে ওঠে ধ্বনি— 'অ্যাডোনিস, অ্যাডোনিস

যাকে আমি খুঁজি সকল সময়, যে আমার ব্যাকুলতা,
তার উপেক্ষা যখন স্মরণে আসে,
তখন আমার মনে পড়ে যায় চড়ুইভাতির আহত পাখির কথা।

চকিতে সুন্দর জাগে

প্রস্তুতি ছিল না কিছু, অকস্মাৎ মগজের স্তরে
স্তরে মেঘলা,
বিদ্যুতের স্পন্দমান শেকড় বাকড়—
অনন্তর সে এলো, কবিতা,
আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে তার চুলে, অসিত শিখার মতো চুলে
আমাকে বদলে দিয়ে বৈপ্লবিক ভাবে।
মাঝে-মধ্যে ভাবি, আজো ভাবি
এ কেমন দাবি নিয়ে এলো
অত্যন্ত রহস্যময়ী চঞ্চলা প্রতিমা ?
এখনও তাকেই ভাবি যে আসে হঠাৎ
অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো মনের নিঃসীম বিরানায়, পুনরায়
চকিতে মিলিয়ে যায়।

কবিতাকে খুব কাছে পেতে চেয়ে কখনো কখনো
কবিতার কাছ থেকে দূরে চলে যাই।

কবিতাকে ভালোবাসি ব'লে পদ্মকেশরের
উৎসব হৃদয়ে উদ্ভাসিত। কবিতার
প্রতি ভালোবাসা ডেকে আনে ভালোবাসা
হতশ্রী জীবনে, খরাদগ্ধ অবেলায় ঢালে জল,
যেমন মৃন্ময়ী চণ্ডালিকা
আনন্দের আঁজলায়। কবিতাকে ভালোবাসি ব'লে
অন্তর্গত ভস্মরাশি থেকে,
চকিতে সুন্দর জাগে অমর্ত্য কণ্ঠের পাখি, যাকে
আত্তার অথবা রুমি আত্মা বলতেন।

মুখোশ

এখন আমাকে রাশি রাশি ফুল. ফুলের বাহারী তোড়া দিচ্ছো,
দাও, করবো না
বারণ। কারণ চলৎশক্তিহীন। প্রজাপতি
কিংবা একরত্তি মাছি এসে যদি বসে নাকের ডগায়, সত্যি
পারবো না তাড়াতে ওদের হাত নেড়ে।

লোবান অথবা
আগরবাতির ঘ্রাণ আমাকে করে না আমোদিত। পড়ে আছি
চিত হয়ে দৃষ্টিহীন দৃষ্টি নিয়ে। হু হু কান্না অথবা গোলাপজল
উভয়ের প্রতি উদাসীন। আমাকে করাবে স্নান
যে লোকটা, চুলকাচ্ছে সে নধর পাছা তার। যে তন্বীর স্তন
হয়নি নমিত শোকে, তার
যৌবন আমাকে জপায় না আর জীবনের
আগড়ম বাগড়ম শ্লোক।

এখন আমাকে দিচ্ছো ফুল, দাও ; দাও ঢেকে
আপাদমস্তক, উঠবে না নিষেধের
তর্জনী আমার। ট্রাকে চেপে কিছুক্ষণ
পরেই বেড়াতে যাবো বনানীতে। ফুরফুরে হাওয়া
লাগবে নিঃসাড় হাড়ে।
আমি ভাঙা বাবুই পাখির বাসা,
বড়ো একা পড়ে আছি স্বপ্নহীন দীর্ঘ বারান্দায়
তোমরা কি আজ আমাকে পরাতে চাও নওশার সাজ ?
পরাও, বারণ আমি করবো না এখন। যা খুশি
তোমরা করতে পারো, তবে সুর্মা কিংবা অন্য কোনো
মৃত্যুগন্ধী প্রসাধনে খুব বেশি বদলে দিও না
আমার নিজস্ব মুখ, যেমন চেহারা ঠিক তেমনটি থাক—
যেন ভিন্ন কারো মুখ আমার নিজের
মুখচ্ছদ ফুঁড়ে
বেরিয়ে না পড়ে, দ্যাখো এখন মুখোশহীন আমি ;
পুরোনো মুখোশ, যার চাপে
আমৃত্যু ছিলাম আমি অস্বস্তির ক্লিষ্ট ক্রীড়নক,
খসে গ্যাছে এক লহমায়। দোহাই তোমরা আর
দিও না আমার মুখে সেঁটে
অন্য কোনো দুর্বহ মুখোশ।